অযাহাক্কাল বাত্বিল

আব্দুল হামীদ মাদানী
সঊদী আরব

সূচীপত্র

ভূমিকা ১
অবতরণিকা ৩
গায়র মুক্বাল্লিদদের অস্তিত্ব ১৫
‘ফেকাহ’ কী? ২১
আহলে হাদীস ও হানাফীদের
মাঝে আসল পার্থক্য ৪৩
তারকা থেকে ঈমানজয়ী কারা? ৪৪
হাদীসের কিতাবের লেখকগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন না ৪৭
দলীল পরস্পর-বিরোধী হলে ৫০
আমীন সশব্দে না নিঃশব্দে? ৫১
নামাযে হাত কোথায় বাঁধবেন? ৬০
রফ্য়ে য়্যাদাইন ৬৮
রফ্য়ে য়্যাদাইন মনসূখ হওয়ার চমৎকার উপমা ৭৩
আহলে হাদীসের কল্পিত মূলনীতি ৭৩
ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাআত ৭৪
মুসাফাহাহ এক হাতে ৮৭
বুখারীর ছাড়া অন্য হাদীস ৯৬
খালি মাথায় নামায ৯৭
নামাযে পা ফাঁক ক’রে দাঁড়ানো ১০০
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ১০৫
তিন তালাক প্রসঙ্গ ১০৮

উপস্থাপনা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستهدى ونستعين، والصلاة والسلام علي إمام الأنبياء والمتقين، محمد المصطفى وعلي آله الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

মহান স্রষ্টা আল্লাহ ﷾ তাঁর প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'খ্বা-তামুন নাবিয়্যীন' ক'রে প্রেরণ করেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর একমাত্র দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার। তাঁর শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ মুক্তিপ্রাপ্ত ও সত্য পথে পরিচালিত লোকের বৈশিষ্ট্য 'মা আনা আলাইহি অআস্‌হা-বী' (আমি ও আমার সহচরবৃন্দ যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত) বিবৃত করেছেন। (তিরমিযী-২৬৪১)

(لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ).

"আমার উম্মাতের ছোট একটি দল সত্যের উপর সদা বিরাজমান থাকবে, বিরোধীরা তাদের ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না, আল্লাহ্ ﷾-র নির্দেশ (কিয়ামত) আসা অবধি তারা এভাবেই থাকবে।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)* রসূলের এই ফরমান সত্যান্বেষী ও সত্য-নির্ভর লোকেদের সংখ্যাল্পতার প্রতি ইঙ্গিতবাহী। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘোষিত দলের সদস্য হলে যে কোন মানুষের মন থেকে দ্বিচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বিলুপ্ত হয়, উদ্ভাসিত হয় নিঃশর্ত আনুগত্য। সে থাকে পূর্ণ জান্নাতী পথে। যে পথের পথিককে আক্রান্ত করে না রজনীর অন্ধকার, খেতে হয় না হোঁচট। যেহেতু পথ অতি পরিষ্কার। *(সহীহ ইবনু মাজাহ)*

আল্লাহ ﷾-র পক্ষ হতে ঈমানের সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত সাহাবা কিরামের দল নিঃশর্তভাবে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-র আনুগত্য করতেন, ছিল না তাঁদের মাঝে ব্যাক্তি-পূজা, তাকলীদের কোন প্রচলন। কিন্তু পরবর্তীতে অধিকাংশ মুসলিমদের হতে রাসূল ﷺ-র সময় কালের ব্যবধান যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই তাঁরা সুন্নাতে রাসূল ﷺ হতে দূরে সরে গেছেন। সুন্নাহ ও উম্মাতের মাঝে দাঁড় করানো হয়েছে 'তাক্বলীদ' নামক বাতিলের শক্ত প্রাচীর। যার প্রচলন ও অনুসরণ উম্মাহ্‌কে করেছে শতধা-বিচ্ছিন্ন।

হকপন্থী উম্মাতীগণ সর্বদা শান্তি-প্রিয়ভাবে এ বিষয়ে মুসলিম জন-সাধারণকে সতর্ক ক'রে চলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোনরূপ আপোষ করতে জানেন না। তাঁরা জানেন না মিথ্যার আশ্রয় নিতে অথবা ছলনার ঘোমটায় নিজেকে আবৃত করতে।

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার জনৈক মুফতী আব্দুল্লাহ ক্বাসেমী সাহেব, "জা'আল হক্ব" নামক একটি 'জাল' বই দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসারী দল আহলে হাদীসের নিন্দা-মন্দ করেছেন। প্রচেষ্টা চালিয়েছেন হক্কের মুখোশ পরে বাতিলকে প্রতিষ্ঠাদানের। 'আল্‌-মুক্বাল্লিদু লায়সা বিআ-লিম' অনুযায়ী প্রকৃত ইলমের সাথে তাঁর সম্পর্ক মনে হয় নেই। এমন রিক্তহস্ত মানুষ যদি অন্যের চর্বিত-চর্বণ দ্বারা উম্মাহকে আরও বেশী বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখেন বা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তো উম্মাতের তরী মাঝ নদীতে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।

মুফ্‌তী সাহেবের বই খানাকে প্রথম আমাকে পড়ে দেখতে বলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার হকপন্থী আলিম ভাই শামসুদ্দীন। জীর্ণ-শীর্ণ শরীরের লোকটি কিন্তু ঈমান বিষয়ে বড্ড দীপ্ত ও শক্ত। বারবার জবাব লেখার অনুরোধও রাখেন, কিন্তু সাংগঠনিক সফরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকায় আমার পক্ষে হয়ে উঠল না। তাছাড়া 'অফাওক্বা কুল্লি যী ইল্‌মিন আলীম' জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী রয়েছেন। পাণ্ডুয়া, হুগলী 'আত্‌-তাওহীদ অ্যাকাডেমী'র প্রাণ-পুরুষ ভাই গুলাম মালিক বইটিকে শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানীর (হাফিযাহুল্লাহ) নিকট প্রেরণ করেন। বয়সে নবীন হলেও লেখনী-জগতে তিনি ক্ষণজন্মা লেখক ও গবেষক। ইতিমধ্যে তিনি শতাধিক ছোট-বড় বই ও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মিল্লাত তাঁর লেখনী দ্বারা বহুলভাবে উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম পারিতোষিক দানে ধন্য করেন। তিনি মুফ্‌তী ক্বাসেমী সাহেবের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনার যথাযোগ্য ও সফল অপারেশন চালিয়েছেন। আশা করি জবাবী বই পাঠে নিরপেক্ষ পাঠকমণ্ডলী সঠিক জ্ঞান লাভে উপকৃত হবেন। মুফ্‌তী সাহেব যদি হক-গ্রহণে উর্বর-দোআঁশ মাটির মত হন, তাহলে তিনিও সত্য পথের সন্ধান পাবেন, ইনশা-আল্লাহ।

আমি আল্লাহ'র নিকট লেখকের বাঈমান দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি যেন আরও বেশী বেশী ক'রে কলম চালাতে পারেন। (আমীন)

বিনীত---

আব্দুল্লাহ সালাফী

সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ

ভূমিকা

হক-বাতিলের লড়াই চিরন্তন। পরন্তু সকলের দাবী, তারাই হকপন্থী। আর মুশকিলটা সেখানেই। তাছাড়া ‘ফারয়ী’ বা গৌণ বিষয়ে ‘ইখতিলাফ’ বা মতভেদ তো থাকবেই। সাহাবাদের মাঝেও ‘ইখতিলাফ’ ছিল। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (١١٩) سورة هود

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। *(হূদঃ ১১৮-১১৯)*

কিন্তু সে মতভেদ নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং তার সাথে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি ক’রে দুশমন হাসানো কোন পক্ষের জন্যই সমীচীন নয়।

লক্ষ্যণীয় যে, নেতায়-নেতায় দ্বন্দ্ব ও তর্কাতর্কি কম হয় অথবা হয় না বললেই চলে। অনেক সময় বিরোধী দলের নেতার সাথে নিজের দলের নেতাকে এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া বা খোশগল্প করতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে দলের অনুসারীদের মাঝে দ্বন্দ্বের ঝড় অতি বেগে তছনছ করে। অনুরূপ দ্বীনের নানা মযহাবের অনুসারীদের মাঝেও হয়ে থাকে, হতে পারে। কারণ, তারা সাধারণ মানুষ এবং তারা তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। কিন্তু কোন উচ্চ পর্যায়ের আলেমের জন্য তা সাজে না। প্রতিপক্ষকে নানা অপবাদ দিয়ে ছোট করা মানায় না। আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ ক’রে লাঞ্ছিত করা তাঁর মুখে-কলমে শোভা পায় না।

সাধারণ যালেম লোকে আগুন লাগালে আলেম-সমাজকে পানি ঢেলে নিভাতে হয়। পানির জায়গায় পেট্রোল ঢালা চলে না। নচেৎ সেই পরিণাম দেখতে হয়, যা মোটেই শুভ নয় এবং যা দুশমনে পছন্দ করে ও দোস্তে অপছন্দ।

মুফতী আব্দুল হামীদ কাসেমী সাহেব ‘জা-আলহক্ব’ বইয়ের প্রশংসায় লিখেছেন, ‘মুফতী সাহেব নিখুত কুরআন (?) হাদিস ও ফিকহাহ এবং ইসলামী জাঁহানের সর্বজনমান্য আল্লামা, পন্ডিত বর্গের মতাদর্শে যুক্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনের কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, উহাদের মাকড়সার জালের মতো যুক্তি ও প্রমাণকে মহিলাদের ঝাড়ুদ্বারা জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করার মতো কুটি কুটি করে দিয়েছেন।’

সত্যিই বলেছেন মুফতী সাহেব। সহীহ হাদীস তাঁদের কাছে মাকড়সার জাল! জানি না, তাঁর বিজ্ঞান ও দর্শনটা কী? আর সত্যিই তিনি ‘উহাদের মাকড়সার জালের মতো যুক্তি ও প্রমাণকে মহিলাদের ঝাড়ুদ্বারা জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করার মতো (তাঁর মনসুখের ঝাঁড়ু দ্বারা) কুটি কুটি করে দিয়েছেন।’

মুফতী সাহেবের চোখে ধরা পড়েছে, তাই লিখেছেন, ‘নবীন লেখক বিষয়সূচী সাজানোর একটু আগোছালো ভাষায় কিঞ্চিৎ জড়তা বিদ্যমান।’ তিনি আরো লিখেছেন, ‘কাহারো মতে “শানিত কৃপান” নাম রাখলে ভাল হতো।’ কিন্তু আমাদের অনেকে

বলেন, ‘বরং “শোণিতাক্ত কৃপাণ” রাখলে আরো ভাল হত। যেহেতু এতে বাগদাদের আকাশ-বাতাসের মতো শোণিতের গন্ধ বিদ্যমান।

ইন শাআল্লাহ ঐ বই দ্বারা ‘মিথ্যা দাবীদার আহলে হাদীস’ সত্যিকার আহলে হাদীসে পরিণত হবে। আর যারা আহলে হাদীস হওয়া সত্ত্বেও উদারতার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করছিল, তারা পাক্কা হানাফী-বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। আর আফসোস করবেন উদারপন্থী হানাফী সুধীমন্ডলী।

ঐ বইয়ের জবাব লিখে কাউকে, কোন মযহাব বা দলকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা মযহাবী কোন্দল যে দূর হবে---সে আশাও করি না। তবে এ আশা করি যে, অনেকের মনের আকাশে জমে উঠা মেঘ সরে যাবে। ছুঁড়ে দেওয়া যে কাদা আমাদের গায়ে লেগেছে, তা প্রক্ষালিত হবে।

‘জা-আলহাক্ব’ বলতে ইসলামের হক এবং ‘যাহাক্বাল বাতিল’ বলতে কুফরী ও শির্কের বাতিলকে বুঝানো হয়েছে আল-ক্বুরআনে। কিন্তু যেহেতু মুফতী সাহেব নিজেদের তাক্বলীদী মযহাবকে ‘হাক্ব’ বা ‘সত্য’ বলে নতুনভাবে ‘সমাগত’ ভেবেছেন, তাই আহলে হাদীসরা সেটাকে ‘বাতিল’ জানলে আমি এই পুস্তিকার নামকরণ করেছি, ‘অযাহাক্বাল বাত্বিল’। আর মহান আল্লাহই হক ও বাতিলের আসল ফায়সালা করবেন কিয়ামতের দিনে।

{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } (٢٥) سورة السجدة

নিরপেক্ষ সুধী পাঠকও বিচার করতে পারবেন। মহান আল্লাহ যাকে যেমন তওফীক দেবেন, সে তেমন পথ গ্রহণ করবে। তবে তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমারঃ ১৭-১৮)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই দলের দলভুক্ত করুন। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
www.abdulhamid-alfaidi-almadani.com

অবতরণিকা

‘সুন্নাহ’ মানে নবীর তরীকা। এর বিপরীত হল ‘বিদআহ’। আর সেই অর্থে আহলে হাদীসরা আহলে সুন্নাহ। একাধিক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের রায়, কিয়াস, যুক্তি ও বুযুর্গদের কথাকে হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আহলে হাদীসরা কারো তাক্বলীদ না ক’রে বর্ণিত সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেয় বলেই তাদেরকে ‘আহলে হাদীস’ বলা হয়। কিন্তু তাতে মুক্বাল্লিদরা খাপ্পা হন। আহলে হাদীসদের কাছে সহীহ হাদীসের দলীল থাকে বলে তারা মুক্বাল্লিদ নয়। আজও নয়। সেদিনও ছিল না, যেদিন ৩ নয়, ৫ বা তার বেশী নয়---কেবল চার মযহাবের মধ্যে এক মযহাবের তাক্বলীদ ফরয হওয়ার উপরে তথাকথিত ‘ইজমা’ কায়েম হয়।

আসলে এ সকল কথা চর্বিত-চর্বণ ছাড়া কিছু নয়। পিষা আটাকে পিষে সময় ও মেহনত বরবাদ বৈ কিছু নয়। ইতিপূর্বেও বহু তথাকথিত ‘হক’ সমাগত হয়েছে এবং তার জবাবে ‘হক’কে ‘বাতিল’ প্রমাণিত ক’রে বই-পুস্তক লেখালেখি হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘায়ত পুস্তক মওলানা আবূ সুহাইব মুহাম্মাদ দাঊদ আরশাদ সাহেব প্রণীত ‘দীনুল হাক্ব’, যা তিনি ‘জাআল হাক্ব অযাহাক্বাল বাতিল’-এর জবাবে প্রণয়ন করেছিলেন। জানি না, আমাদের মুফতী সাহেবগণ সে সব বই পড়েছেন কি না? পড়লে নিশ্চয় একজন ‘সাধারণ গায়র মুক্বাল্লিদ’কে সম্বোধন ক’রে কাল্পনিক কথোপকথন সুসজ্জিত ক’রে নিজে নিজে ‘বাহবা ও দুআ’ নিতেন না।

তার চেয়ে আরো বিস্ময়কর ব্যাপার পুরস্কার ঘোষণা ক’রে আস্ফালন করার কথা! যাতে সাধারণ মানুষের নিকটে উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জের নিশ্চয়তা প্রকাশ পায়, নিজের ইলমী দাপট প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দলছাড়া হয়ে কোন মযহাবী লামযহাবীর দলে না ভিড়ে।

কিন্তু এক লক্ষ টাকা খুবই কম হয়ে গেছে মুফতী সাহেব! এক কোটিও বলতে পারতেন। কারণ, তা তো আপনাকে দিতে হতো না। ঐ যে এক লোক বলেছিল, ‘আমাকে যে বুঝাতে পারে, ঘর-সর্বস্ব দেব তারে।’

এ ঘোষণা শুনে তার বউ কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ‘ওগো! তুমি এ ঘোষণা কেন করলে? ওরা যদি তোমাকে বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে বাস করব?’

লোকটি বলল, ‘ক্ষেপী কাঁদছিস কেন? কোন ভয় নেই। আমি বুঝলেই

তো?’

এইভাবে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সাদা মনের মানুষদেরকে আটকে রাখতে পারলেও পারতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানীদেরকে পারবেন না। কারণ মহান আল্লাহ জ্ঞানী মানুষের প্রশংসা ক’রে বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার (ইত্তিবা’) অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমারঃ ১৭-১৮)*

অতএব মধুমক্ষিকা ঠিক পুষ্প অনুসন্ধান ক’রে মধু আহরণ করবে। পুষ্পেরর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য ও সৌরভ থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

আহলে হাদীসরা ফিক্বহ, ইজমা’ ও কিয়াস সবই মানে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধানুকরণ ক’রে নয়। আহলে হাদীসরা সর্বোপরি কিতাব ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন-হাদীস বুঝতে কারো অন্ধভাবে ‘তাক্বলীদ’ করে না। অবশ্য ইত্তিবা’ করে। দলীল ও যুক্তি যাঁর বলিষ্ঠ, তাঁর মতের অনুসরণ করে।

মুক্বাল্লিদগণ চার মযহাবকে ‘হক্ব’ বলে জানেন। তাই তাঁদের মযহাবের খেলাপ হলেও কোন মালেকী ভ্রষ্ট নয়, কোন শাফেয়ী ভ্রষ্ট নয় এবং কোন হাম্বলী ভ্রষ্ট নয়। তাদের পিছনে নামায হবে। ভ্রষ্ট শুধু আহলে হাদীসরা। তাদের পিছনে নামায হবে না। কারণ তারা মযহাব মানে না, অথচ মযহাব মানা ফরয। তারা গায়র মুক্বাল্লিদ, তারা চার ইমাম ছাড়া অন্য ইমামের বুঝ মতে হাদীস বুঝে ও মানে!

আহলে হাদীসরা তাই বলে, যা চার ইমাম বলে গেছেন, ‘ইযা স্বাহ্হাল হাদীষু ফাহুয়া মাযহাবী।’ অর্থাৎ, হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মযহাব। আর এই জন্য ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর ছাত্র আবূ ইউসুফ তাঁর তাক্বলীদ করেননি। ইমাম মালেক (রঃ)এর ছাত্র ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর তাক্বলীদ করেননি। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)এর ছাত্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) তাঁর অন্ধানুকরণ করেননি। যেহেতু তাঁরা ছিলেন আহলে

হাদীস।

পক্ষান্তরে মুক্বাল্লিদগণ তাঁদের মযহাবের তাক্বলীদ করার ব্যাপারে ইজমা’ কায়েম ক’রে নিলেন। তারপর তাঁরা এমন তাক্বলীদ করতে লাগলেন যে, তাঁদের এক ইমাম আবুল হাসান কারখী বলেই বসলেন,

كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই আয়াত, যা আমাদের মযহাবপন্থীদের মযহাবের পরিপন্থী, তা হয় ব্যাখ্যেয়, না হয় মনসূখ (রহিত)। আর প্রত্যেক অনুরূপ হাদীসও ব্যাখ্যেয় অথবা রহিত!! *(আদ্দুর্রুল মুখতার ১/৪৫ টীকা, আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহ, আলবানী ১/৮৮)*

মুক্বাল্লিদগণ একটি মযহাবে ঘনীভূত থাকেন। পক্ষান্তরে আহলে হাদীসগণ হাদীস অনুপাতে আমল বদলায়। আর এ জন্যই একই বিষয়ে কোন কোন ইমামের একাধিক মত পাওয়া যায়।

মুক্বাল্লিদগণ পরবর্তীতে হাদীস ‘যয়ীফ’ জানতে পারলেও তার উপর আমল বর্জন করেন না, কারণ সে আমল তাঁদের মযহাব। পক্ষান্তরে আহলে হাদীসরা ‘যয়ীফ’ জানতে পারলে আমল বর্জন করে এবং কেবল সহীহ হাদীসের উপর আমল করে।

মুক্বাল্লিদগণ ফিক্বহের মসলার উপর আমল করেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য কিতাব ও সুন্নাহর দলীল ও তাবীল খোঁজেন। অতঃপর ‘যয়ীফ’ বা ‘জাল’ হাদীস হলেও তা পেশ করতে ও মানতে কুণ্ঠিত হন না। পক্ষান্তরে আহলে হাদীসরা হাদীস পেলেই চোখ বন্ধ ক’রে আমল শুরু ক’রে দেয় না। বরং সে ক্ষেত্রে তারা কিছু বিষয় মান্য মনে করে ঃ-

(১) এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, হাদীস হল দুটি অহীর অন্যতম।

(২) হাদীসের বক্তব্যকে নির্ভুল ও নিষ্কলুষ বলে নিঃসন্দেহে মেনে নেয়। যেহেতু হাদীস যাঁর, তিনি হলেন নির্ভুল ও নিষ্পাপ মানুষ।

(৩) সেটা সত্যপক্ষে তাঁর হাদীস কি না, তা অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। তা সহীহ কি না, তা জানা জরুরী। তাই তার সনদের ‘তাহক্বীক্ব’ করে।

(৪) সহীহ প্রমাণিত হলে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া ওয়াজেব মনে করে; যদিও তা নিজ জ্ঞান ও বিবেক বহির্ভূত মনে হয় এবং তার পিছনে যুক্তি ও হিকমত না বুঝা যায়।

(৫) যয়ীফ (দুর্বল), বা মওযূ’ (জাল) প্রমাণিত হলে তা বর্জন করে।

(৬) হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝে। আপাতদৃষ্টিতে দু’টি বা তারও বেশী হাদীস পরস্পর-বিরোধী মনে হলে তা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা

ক’রে সকল হাদীসকে মানার চেষ্টা করে এবং চোখ বুজে ‘মনসূখ’ বলে কোন সহীহ হাদীসকে বর্জন করে না। অথবা ঝাঁটা দিয়ে মাকড়ষার জাল মুছার মতো মুছে ফেলে না। কারণ, হাদীসে রাসূলকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করাই বৃহৎ বেয়াদবী।

(৭) হাদীসের নাসেখ-মনসূখ (রহিত-অরহিত) নির্দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। নাসেখ ‘সহীহ’ হলে তবেই বিপরীত হাদীসকে ‘মনসূখ’ বলে মানে। নচেৎ কোন দুর্বল হাদীস সহীহ হাদীসকে মনসূখ করতে পারে না।

মুশকিল এখানেই শেষ নয়। নাসেখ-মনসূখ ছাড়া মুক্বাল্লিদগণ তাঁদের মযহাব-সমর্থক বহু হাদীসকে ‘যয়ীফ’ প্রমাণ ক’রে ছাড়েন, যেগুলি আহলে হাদীসের নিকট সহীহ। সুতরাং কেউই নিজের ঘোলকে টক বলতে চান না। আর তার ফলে কোন ফায়সালাও হয় না।

সুতরাং মতভেদ তো থাকবেই। সাহাবাগণের মাঝেও মতভেদ ছিল। কিন্তু কোন্ সাহাবীর মত প্রাধান্যযোগ্য? মযহাবপন্থীদের কাছে মযহাব-সমর্থক এবং আহলে হাদীসদের কাছে হাদীস সমর্থক অথবা যা সহীহভাবে প্রমাণিত তাই প্রাধান্য পায়।

না, না। গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার পদ্ধতিতে ‘হক্ব’ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, ‘হক্বের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।’ *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

এ মর্মে মুফতী লিয়াকত আলি সাহেবের কলম থেকে একটি সত্য কথা কাগজবদ্ধ হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘আসলে শাখা-প্রশাখা (অর্থাৎ ফারয়ী বা জুয্য়ী) মস্‌লা-মাসায়েলে মতভেদ থাকবে। তাই বলে তা নিয়ে ফেৎনা ফাসাদ করা মোটেই সমীচিন নহে।’ *(জা-আলহক্ব গ পৃষ্ঠা)*

খুবই সুন্দর কথা! আসলে উভয় পক্ষের গোঁড়ারাই এই শ্রেণীর ফিৎনা সৃষ্টি ক’রে থাকে। কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি ক’রে অপরকে ‘কাফের’ বানিয়ে গালাগালি ক’রে থাকে এবং একে অপরের পিছনে নামায অশুদ্ধ হওয়ার ফতোয়া জারী ক’রে থাকে। একে অপরকে ‘জাহান্নামী’ বানিয়ে নিজেকে জান্নাতের হকদার ও ঠিকেদার ক’রে থাকে। আর কোথাও কোথাও অজ্ঞদের মাঝে হাতাহাতিও হয়ে থাকে!

মুফতী লিয়াকত সাহেব বলেন, ‘যাঁরা প্রকৃত আহ্‌ল হাদীস তাঁরা সবাই মজহাব মান্য করে চলেন। চারি মজহাবের কোনো না কোনো মজহাবকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। কুরয়ান-শরীফ এবং হাদীস শরিফে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।’

কীসের প্রমাণ মুফতী সাহেব? ‘যাঁরা প্রকৃত আহ্‌ল হাদীস তাঁরা সবাই

মজহাব মান্য করে চলেন।'---এ কথার প্রমাণ? নাকি 'চারি মজহাবের কোনো না কোনো মজহাবকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।'---এ কথার প্রমাণ? কী বুঝাতে চেয়েছেন ভাইজান সাদা মনের পাঠককে?

নাকি বুঝাতে চেয়েছেন, মজহাবের তক্বলীদ করা ফরয। 'কুরয়ান-শরীফ এবং হাদীস শরিফে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে?'

নাকি চারি মজহাবের তক্বলীদ ফরয। 'কুরয়ান-শরীফ এবং হাদীস শরিফে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে?'

যদি কুরআন-হাদীসে এ কথার ভুরি ভুরি প্রমাণ থাকে, তাহলে বাকী মযহাবগুলির তক্বলীদ ফরয হল না কেন? নাকি সেগুলিকে আপনারা আপনাদের ঘরোয়া ইজমা'র গুলিতে গুল ক'রে দিয়েছেন?

তাই তো ভুরি ভুরি প্রমাণের দু'টি প্রমাণ পেশ করেছেন ঘরোয়া ফতোয়া থেকে। আর ফিকাহ বইয়ের টীকায় লেখা আল্লামা তাহতাবীর ফতোয়ায় গায়র মুক্বাল্লিদদেরকে 'বেদয়াতী এবং জাহান্নামী' বানিয়ে ছেড়েছেন!

তাহলে 'ফেৎনা' কীভাবে থামবে বলুন? সরিষার দানাতেই যে ভূত ঢুকে আছে সাহেব! মনকে উদার না করলে তো আর ফিৎনা থামানো যায় না।

আমরা মনে করি, মুক্বাল্লিদরা প্রকৃত আহলে হাদীস নন। কারণ, তাক্বলীদ করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সহীহ হাদীস মানেন না। বরং আহলে হাদীসরাই প্রকৃত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। কারণ, তারা চার ইমামের মৌলিক নীতিকে মানে। সেই নীতি 'হাদীস ও সুন্নাহর মূল্যমান' পুস্তিকা থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ-

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

১। 'যখন হাদীস সহীহ হবে, তখন সেটাই আমার মযহাব। (হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।)' *(ইবনুল আবেদীন ১/৬৩, রাসমুল মুফতী ১/৪, ঈক্বাযুল হিমাম ৬২পৃঃ)*

২। 'কারো জন্য আমাদের কথা মেনে নেওয়া বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে জেনেছে যে, আমরা তা কোত্থেকে গ্রহণ করেছি। (অর্থাৎ, দলীল না জেনে আমাদের অন্ধানুকরণ বৈধ নয়।)' *(হাশিয়া ইবনুল আবেদীন ৬/২৯৩, রাসমুল মুফতী ২৯, ৩২পৃঃ, শা'রানীর মীযান ১/৫৫, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩০৯)*

৩। 'যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, তার জন্য আমার উক্তি দ্বারা ফতোয়া দেওয়া হারাম।' *(আন-নাফিউল কাবীর ১৩৫পৃঃ)*

৪। 'আমরা তো মানুষ। আজ এক কথা বলি, আবার কাল তা প্রত্যাহার করে নিই। (এক দলীল অনুসারে আজ একটি মত পেশ করি, আবার অন্য দলীল অনুসারে কাল অন্য মত পেশ করি।)' *(ঐ)*

৫। 'যদি আমি এমন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীসের পরিপন্থী, তাহলে আমার কথাকে বর্জন করো। (দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরো।)' *(ঈক্বাযুল হিমাম ৫০পৃঃ)*

৬। 'আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস শিরোধার্য। শিরোধার্য সাহাবা ﷺ থেকে বর্ণিত বাণী। আর তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত বাণী তেমন নয়; কারণ তাঁরা যেমন পুরুষ, আমরাও তেমনি (সমপর্যায়ের) পুরুষ।'

৭। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'আপনি যদি এমন কথা বলেন, যা আল্লাহর কিতাবের প্রতিকূল, (তাহলে আমরা কী করব)?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার কথা বর্জন করে আল্লাহর কিতাবকে মেনে নেবে।' বলা হল, 'যদি রসূল ﷺ-এর উক্তি তার প্রতিকূল হয় তাহলে?' তিনি বললেন, 'তাহলে আমার কথা বর্জন করে রসূল ﷺ-এর হাদীস মেনে নেবে।' বলা হল, 'যদি সাহাবাদের উক্তি তার প্রতিকূল হয় তাহলে?' তিনি বললেন, 'তাহলে আমার কথা বর্জন করে সাহাবাদের উক্তি মেনে নেবে।'

বলা বাহুল্য, প্রকৃত হানাফী (ইমাম আবূ হানীফার ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীসের মযহাবকেই নিজের মযহাব বলে মান্য করে।

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

১। 'আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কথা ভুল হতে পারে আবার ঠিকও হতে পারে। সুতরাং তোমরা আমার মতকে বিবেচনা করে দেখ। অতঃপর যেটা কিতাব ও সুন্নাহর অনুকূল পাও, তা গ্রহণ কর। আর যা কিতাব ও সুন্নাহর প্রতিকূল তা বর্জন কর।' *(জামেউ বায়ানিল ইল্ম ২/৩২, উসূলুল আহকাম ৬/১৪৯)*

২। 'নবী ﷺ-এর পর তাঁর কথা ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণীয় হতে পারে, আবার বর্জনীয়ও।' *(ইরশাদুস সালেক ১/২২৭, জামেউ বায়ানিল ইল্ম ২/৯১, উসূলুল আহকাম ৬/১৪৫, ১৭৯)*

বলা বাহুল্য, প্রকৃত মালেকী (ইমাম মালেকের ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

১। 'আমি যে কথাই বলি না কেন অথবা যে নীতিই প্রণয়ন করি না কেন, তা যদি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বর্ণিত (হাদীসের) খিলাপ হয়, তাহলে সে কথা (ও সেই নীতি)ই মান্য, যা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন। আর সেটাই আমার কথা।' *(তারীখু দিমাশ্ক, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৬৩-৩৬৪, ঈক্বাযুল হিমাম ১০০পৃঃ)*

২। 'মুসলিমরা এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য অন্য কারো কথা মেনে তা বর্জন করা হালাল নয়।' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৬১)*

৩। 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' *(মাজমূ' ১/৬৩, শা'রানী ১/৫৭)*

৪। 'আমার পুস্তকে যদি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর খিলাপ কোন কথা পাও, তাহলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর কথাকেই মেনে নিও এবং আমি যা বলেছি তা বর্জন করো।' *(ইবনে আসাকির, নওয়াবীর মাজমূ' ১/৬৩, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৬১)*

৫। 'সহীহ সুন্নাহ (হাদীস) বিরোধী যে কথাই আমি বলেছি, সে কথা আমি আমার জীবনে এবং মরণের পরেও প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' *(হিলয়াহ ৯/১০৭, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩৬৩)*

৬। 'যখন দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি; যার বিপরীত কথা নবী ﷺ-এর সহীহ হাদীসে রয়েছে, তখন মনে করো যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' *(হিলয়াহ ৯/১০৬, ইবনে আসাকির)*

৭। 'যে কথাই আমি বলি না কেন, তা যদি সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী হয়, তাহলে নবী ﷺ-এর হাদীসই অধিক মান্য। সুতরাং তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না।'

৮। 'নবী ﷺ থেকে যে হাদীসই বর্ণিত হয়, সেটাই আমার কথা; যদিও তা আমার নিকট থেকে না শুনে থাক।' *(ইবনু আবী হাতেম ৯৩-৯৪পৃঃ)*

৯। (নিজ ছাত্র ইমাম আহমাদকে সম্বোধন ক'রে বলেন,) 'হাদীস ও রিজাল সম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে অধিক জান। অতএব হাদীস সহীহ হলে আমাকে জানাও, সে যাই হোক না কেন; কুফী, বাসরী অথবা শামী। তা সহীহ হলে সেটাই আমি আমার মযহাব বানিয়ে নেব।' *(ইবনু আবী হাতেম ৯৪-৯৫পৃঃ, হিলয়াহ ৯/১০৬, ইবনে আসাকির প্রমুখ)*

বলা বাহুল্য, প্রকৃত শাফেয়ী (ইমাম শাফেয়ীর ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীস অনুযায়ী কর্ম করে।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

১। 'তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না, মালেকেরও অন্ধানুকরণ করো না। অন্ধানুকরণ করো না শাফেয়ীর, আর না আওযায়ী ও সওরীর। বরং তোমরা সেখান থেকে গ্রহণ কর, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ, তাঁরা যেমন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মাসায়েল গ্রহণ করেছেন,

তেমনি তোমরাও উভয় থেকেই মাসায়েল গ্রহণ কর।)' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩০২)*

২। 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি ধ্বংসোন্মুখ।' *(ইবনুল জাওযী ১৮২পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, প্রকৃত হাম্বলী (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের ভক্ত ও অনুসারী) হল সেই ব্যক্তি, যে ইমামের এই সকল উক্তির উপর আমল করে সহীহ হাদীসকে গ্রহণ ও মান্য করে।

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

'কিতাব ও সুন্নাহকে নিজের ইমাম বানিয়ে নাও, উভয়কে গভীর ধ্যান ও গবেষণার সাথে অধ্যয়ন কর এবং ঐ দুয়ের উপরই আমল কর। আর অন্য কারো কথা, মত ও প্রলাপে ধোকা খেও না।' *(ফুতূহুল গাইব)*

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ-

'যদি কখনো পীরের কোন হুকুম শরীয়তের বিপরীত মনে হয়, তাহলে মুরীদের সেই হুকুম তামীল করতে তাঁর অন্ধানুকরণ করবে না।'

এই স্বর্ণসম নীতি যদি আপনি মেনে নিতে পারেন, তাহলে তো ফিৎনা শেষ। নচেৎ আগুনের উৎসমুখ বন্ধ না ক'রে শিখায় পানি ঢাললে আর কী হবে বলুন? ভুরি ভুরি হাদীস পেশ করলে লাভ কী হবে বলুন? মুহাদ্দিসীনদের হাদীসী পদ্ধতি অনুযায়ী যদি হাদীস গ্রহণ-বর্জন না করেন এবং কেবল মযহাব-সমর্থক হাদীসকে সহীহ, আর মযহাব-বিরোধী হাদীসকে যয়ীফ, মনসূখ অথবা ব্যাখ্যেয় ভাবেন, তাহলে কী সেই 'আপোস মানব, কিন্তু তাল-গাছটি আমার'-এর মতো ব্যাপার হবে না ভাইজান!

কোরিয়াতে বসে এক মুফতী সাহেব নেটে বললেন, "আপনারা আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলিকে 'যয়ীফ' বললে আমরা মেনে নেব কেন? অমুক ইমাম 'সহীহ' বললে আলবানী সেটাকে 'যয়ীফ' বললে আমরা কেন মানব? আলবানী কি ঐ ইমাম থেকেও বড় নাকি? আর আপনারা আলবানীর কথা মেনে নিয়ে হাদীসকে 'সহীহ-যয়ীফ' বলছেন, তাহলে আপনারাও তো তার তাক্বলীদ করছেন। অথচ আপনারাই বলেন, 'তাক্বলীদ হারাম।"

আমি বললাম, "মুফতী সাহেব! মুস্তালাহে হাদীসের দু'-তিনটি বই পড়ে সে রহস্য আপনি বুঝতে পারবেন না। এ রহস্য বুঝার জন্য ইলমুল ইসনাদ, ইলমুল জারহি অত্-তা'দীল, ইলমুর রিজাল ইত্যাদি জানতে হয়। আর আহলে হাদীসরা কোন নির্দিষ্ট আলেমের তাক্বলীদ করে না, না আলবানীর, আর না ইবনে বাজের। তারা ইত্তিবা' করে মাত্র। যদিও আপনি ইবনে

বাজকে 'ফিৎনাবাজ' বলেছেন এবং সঊদী আরবের আলেম-অনালেম সকলকে 'ভ্রষ্ট ওয়াহাবী' বলেছেন। আবার নিজেদের পক্ষ মজবুত করার জন্য তাদেরকে হাম্বলীও বলে থাকেন। কুতুবে সিত্তার মুহাদ্দিসদেরকেও নিজেদের মতো মুক্বাল্লিদ মনে করেন।'

---আপনি কি মুজতাহিদ?

---না, আমি মুজতাহিদ নই। তবে কোন না কোন মুজতাহিদের ইত্তিবা' করি। কারো অন্ধভাবে তাক্বলীদ করি না। আচ্ছা! ওয়াহাবীদের পিছনে নামায হবে না---আপনাদের ফতোয়া। এই জন্য আহলে হাদীসের কোন বুযুর্গ আলেম আপনাদের সাথে তবলীগে গেলে তাঁকে ইমামতি করতে দেওয়া হয় না। তাহলে হজ্জ করতে এসে হারামে বা জামাআতে নামায পড়েননি নাকি?

---পড়েছি তো।

---তাহলে ফতোয়া মানেন না, নাকি দোহরানোর ফতোয়া মেনেছেন? নাকি আমাদের কিছু উদার আহলে হাদীসের আপনাদের সাথে মিলে-মিশে তবলীগ করার মতো আপনিও উদারতার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন?

তারপর নানা কথা বলে তিনি আমাদেরকে অন্যান্য ক্বাসেমী সাহেবদের মতো 'গুমরাহ'ই প্রমাণ করতে চাইলেন।

ওদিকে মুফতী লিয়াকত আলী সাহেব লিখেছেন, 'হজরত শাহ্ ওলিওল্লাহ (রঃ) এত বড় আলেম, মুহাদ্দিশ, মুফাক্কির, ইসলামী অহিন তত্ত্বীদ, (?) আধ্যাত্মবীদ এবং আরো বহু গুনে গুনান্বিত হওয়া সত্ত্বেও হুজুর আকরম ছল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম তাঁকে মুকাল্লিদ এবং চার মজহাবের কোন এক মজহাবকে মানতে বাধ্য করেছিলেন। যার ফল শ্রুতিতে তিনি হানাফী রূপে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।'

'হুজুর আকরম ছল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম তাঁকে মুকাল্লিদ এবং চার মজহাবের কোন এক মজহাবকে মানতে বাধ্য করেছিলেন' স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝি?

তাহলে তিনি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে লিখলেন কেন? তিনি লিখেছেন,

ومن أسباب التحريف ، تقليد غير المعصوم :

ومنها تقليد غير المعصوم أعني غير النبي الذي ثبتت عصمته ، وحقيقته أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة ، فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالباً ، فيردوا به حديثاً صحيحا ، وهذا

التقليد غير ما اتفق عليه الأمة المرحومة ، فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن المجتهد يخطئ ، ويصيب ، ومع الاستشراف لنص النبي ﷺ في المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك التقليد ، واتبع الحديث ، قال رسول اللّه ﷺ في قوله تعالى : {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه} : « إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه » .

অর্থাৎ, বিকৃতির একটি কারণ হল মা'সূম ছাড়া অন্য কারো তাক্বলীদ করা ঃ

একটি কারণ এই যে, মা'সূম ছাড়া অন্যের তাক্বলীদ করা। অর্থাৎ, সেই নবী ছাড়া অন্যের তাক্বলীদ করা, যাঁর 'ইসমত' (নির্ভুলতা) প্রমাণিত। আর এর বাস্তবতা এই যে, উম্মতের উলামাগণের কোন একজন কোন মাসআলায় ইজতিহাদ করেন। অতঃপর তাঁর অনুসারিগণ এই ধারণা করে যে, তিনি নিশ্চিতরূপে অথবা অধিকাংশরূপে সঠিকতার উপরে আছেন। সুতরাং তারা তাঁর কারণে সহীহ হাদীসকে রদ করে দেয়। এ তাক্বলীদ তার বিপরীত, যার উপর করুণার পাত্র উম্মত একমত ছিলেন। যেহেতু তাঁরা মুজতাহিদদের তাক্বলীদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবে সেই সাথে (মুক্বাল্লিদকে) এ কথা জানতে হবে যে, মুজতাহিদের ইজতিহাদ ভুল হতে পারে, ঠিকও হতে পারে। সেই সাথে ঐ মাসআলায় নবী ﷺ-এর উক্তির অনুসন্ধান ও অপেক্ষা থাকতে হবে এবং এই সংকল্প থাকতে হবে যে, যে বিষয়ে সে তাক্বলীদ করেছে, তার বিপরীত সহীহ হাদীস প্রকাশ পেলে তাক্বলীদ বর্জন করবে এবং হাদীসের অনুসরণ করবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে,

যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহঃ৩১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তারা তাদের পূজা করত না। কিন্তু যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল করত, তখন তারা তা হালাল গণ্য করত এবং যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হারাম করত, তখন তারা তা হারাম গণ্য করত।" *(হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ ১/২৬১, আরো দ্রঃ ১/৩৩৫, তাফহীমাত ২/২৪০)*

এই জন্যই তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলা হয়। তিনি তথাকথিত 'মুক্বাল্লিদ' ছিলেন না।

ওয়াহাবী দ্বীন সংস্কারক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য জানেন কি?

ওয়াহাবীদের সংস্কারক সম্বন্ধে গাংগুহী সাহেবের মন্তব্য পড়েছেন কি?

মুফতী সাহেবান তাঁদের উদারপন্থী আকাবেরে উলামাদের 'ওয়াহাবী' সম্বন্ধে মন্তব্য পড়ে থাকলে ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার করতেন না।

বিষোদ্গার করতে গিয়ে মুফতী জুবায়ের সাহেবের কলম থেকে আহলে হাদীসের জন্য 'কুসুম' বা 'ফুল' শব্দ ফসকে গেছে। তবে তাআস্সুবের জ্বালায় তিনি সে ফুলকে ঝলসানো দেখতে পেয়েছেন। সে ফুলের পাপড়ি ও রেণুতে সুগন্ধের জায়গায় 'দুর্গন্ধ' পেয়েছেন! জানি না, দোষ কীসের? কুসুমের, নাকি নাসারন্ধ্রের? বিচার আল্লাহই করবেন।

তারপর তিনি জামাআতে ইসলামী ও আহলে হাদীসকে 'এক মায়ের দুই সন্তান' বলে আখ্যায়ন করেছেন। কিন্তু মুফতী সাহেব! আহলে হাদীসের মা তো গায়র মুক্বাল্লিদ। আসলে জামাআতী, তাবলীগী, দেওবন্দী ও ব্রেলভী আপনাদের ঐ এক মুক্বাল্লিদ মায়ের চার সন্তান নয় কি?

আর গ্রন্থকার মুফতী আব্দুল্লাহ সাহেব তো আহলে ক্বিবলাহ মুসলিম ভাইদেরকে 'জাহান্নামী' প্রচার ক'রে বই লিখে আল্লাহর নিকট তার 'ক্ববূলিয়াত' কামনা করেছেন এবং এই ক্ষুদ্র মেহনতের বিশাল সওয়াব আবার দাদাজি ও দাদিমায়ের রূহের জন্য বখশে (?) দিয়েছেন। 'আল্লাহর দরবারে কৈফিয়াতের দেওয়ার ভয়তে' বহু সংখ্যক মুসলিম জনগণকে ভ্রষ্ট, জাহান্নামী তথা 'কাফের' বানিয়েছেন। তাঁর এ ভয় হয়নি যে, তারা যদি কাফের বা মুনাফিক না হয়, তাহলে তিনি নিজে কে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا).

"যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন সে কথা দু'জনের

মধ্যে একজনের উপর বর্তায়।" *(মুসলিম)*

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'গয়ের মুকাল্লিদ যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে থাকেন। অর্থাৎ হাদীস ওয়ালা ফের তারাই হাদীস অমান্যকারী এবং হাদীসের বিপরিত চলে থাকে। নিজেরাই পথ ভ্রষ্ট অপরকে পথ ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেন।' (ছ পৃষ্ঠা)

সত্য ও বড় দুঃখের বিষয় যে, আহলে হাদীস নামধারী অনেকে হাদীস তো দূরের কথা, কুরআনও মানে না। এই যেমন, বিবিকে পর্দা করে না, সূদ খায়, ঘুস খায়, ব্যভিচার করে, গীবত করে, দাড়ি চাঁছে অথবা ছোট ক'রে ছাঁটে, মাদ্রাসার টাকা তসরুফ করে। এরা হল আহলে মাআসী (অবাধ্য) লোক। এমন তো আহলে সুন্নাহও বহু আছে, যারা 'সুন্নাহ' মানে না এবং এমন বহু হানাফীও আছে যারা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর সকল কথা মানে না।

আর যদি ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে বলেন, তাহলে আহলে হাদীসরা 'সহীহ' হাদীসকে মানতে গিয়ে 'যয়ীফ' হাদীস অমান্য করে। যেমন আপনারাও মযহাব-সমর্থক এক হাদীসকে মানতে গিয়ে অন্য হাদীসকে অস্বীকার করেন। তাহলে গড়পড়তায় অবস্থাটা কি একই দাঁড়াচ্ছে না মুফতী সাহেব!

মুফতী সাহেব! আপনি যে কথা আমভাবে লিখে প্রচার করেছেন, তা মহা অপরাধ। প্রতিপক্ষের দু-একজনের আমল দেখে পুরো জামাআতের উপর আম মন্তব্য করেছেন। এ তো হাঁড়ির ভাত নয় মুফতী সাহেব যে, ২/৩টি ভাত টিপে দেখেই গোটা হাঁড়ির ভাতের পাত্তা লাগাবেন।

আপনার এ মন্তব্য কত বড় অন্যায়, তা যদি অনুমান করতে চান, তাহলে আপনার মতো যুক্তিমার্কা একটি গল্প শুনুন। এক লোক কোন গ্রামে বেড়াতে গিয়ে নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখে তার জুতো চুরি হয়ে গেছে। বহু খোঁজাখুঁজির পর তা না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ফেলল, 'এ গাঁ, চোর গাঁ। এ গাঁয়ের লোকরা চোর।'

এ কথা শুনে গ্রামের যুবকেরা তার যে কী দুরবস্থা করেছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রত্যেক জামাআতেই ভাল-মন্দ, নরমপন্থী, চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী আছে। সুতরাং "অইযা কুলতুম ফা'দিলূ...।" মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ

اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(মাইদাহ ঃ ৮)*

কিছু লোকের দোষ ধরে গোটা বংশ, জাতি বা দেশের দোষ বর্ণনা করা মহা অপরাধ, সে কথা মুফতী সাহেবের অজানা নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلًا فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ).

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতা অস্বীকার ক’রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী)*

গায়র মুক্বাল্লিদদের অস্তিত্ব

মুফতী ক্বাসেমী সাহেব লিখেছেন, ‘সারা পৃথিবীর মধ্যে ফেরকা আহলে হাদীস গয়ের মকাল্লিদীনের অজুদ ও নাম নিসানা পরিপূর্ণভাবে না পূর্বে ছিল আর না এখনও আছে কেবল মাত্র হিন্দুস্থান পাকিস্থান এবং বাংলাদেশে কিছু কিছু দেখা যায়। আর যা কিছু দেখা যাচ্ছে হিন্দুস্থানে ইংরেজ হুকুমতের পরে, ইতিপূর্বে সারা বিশ্বে এই ফেরকার কোনো নাম ও নিষানা ছিল না। কেননা এই ফেরকার জম্মদাতা হলো একমাত্র ইংরেজি হুকুমত।’

প্রিয় পাঠক! মুফতী সাহেবের ভাষা ও বাচনভঙ্গি ভালোরূপে খেয়াল করুনঃ-

প্রথমতঃ তিনি আহলে হাদীসকে ‘ফির্কা’ বলে আখ্যায়ন করেছেন।

অথচ আহলে হাদীস কোন ফির্কার নাম নয়। আহলে হাদীস হল ‘মূল ইসলাম’।

সেই মেরুদণ্ডসম পথকেই ‘সালাফিয়াত’ বলা হয়। যেহেতু সে পথের পথিকরা সলফ তথা সাহাবাগণের বুঝ অনুসারে কুরআন-হাদীস বুঝে। যাঁদের পথ অবলম্বন ছাড়া মুসলিম বেহেশ্তের পথ পেতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(নিসা ঃ ১১৫)*

সালাফিয়াতও কোন মযহাব বা ফির্কার নাম নয়। এ হল প্রকৃত ও আসল ইসলামের নাম। মুসলিমদের নানা মত ও নানা পথ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি সলফদের মত ও পথ অবলম্বন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ও আসল মুসলিম।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক’টি জাহান্নামী হবে।” অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

আহলে হাদীসরাই হল (হাদীসে বর্ণিত) ‘জামাআত’। তাঁরাই হলেন নানা ‘আহলে বিদআহ ও ফুরক্বাহ’র মাঝে ‘আহলে সুন্নাহ অলজামাআহ’।

তাঁরাই হলেন ‘জামাআতুল মুসলিমীন’। নানা আক্বেলপন্থীদের মাঝে তাঁরাই হলেন সুন্নাহ বা হাদীসপন্থী। তাঁদেরকেই ‘আহলে সুন্নাহ বা হাদীস বা আষার’ বলা হয়। যেহেতু অন্যেরা যখন আক্বেল থেকে দলীল দেয়, তখন তাঁরা সুন্নাহ ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করেন। অন্যেরা যখন অন্যের ‘সুন্নাহ’ (তরীকা)কে অবলম্বন করে, তাঁরা তখন নবীর ‘সুন্নাহ’ ও তরীকাকে অবলম্বন করেন। অন্যেরা মতভেদের সময় যখন ‘অমুক-তমুক’-এর পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁরা তখন নবী ও তাঁর সাহাবার পক্ষাবলম্বন করেন।

কোন মতভেদের সময় যখন অন্যেরা ‘অমুক-তমুক’-এর পক্ষপাতিত্ব করে, তখন তাঁরা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর পক্ষপাতিত্ব করেন।

মতভেদ তো হতেই পারে, তা বলে কি তার ফায়সালা নেই? অবশ্যই আছে। অন্যেরা অন্যের ফায়সালা মানে, আর তাঁরা মানেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসাঃ ৫৯)*

তাঁরাই হলেন জামাআত। এক রাষ্ট্রে একই নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জামাআত। অথবা নবী ও সাহাবার পথের অনুগামী জামাআত, চাহে তার সংখ্যা কম হোক বা বেশি। যেহেতু অনুগামীদের সংখ্যাধিক্য হকের দলীল নয়। সংখ্যায় কম হলেও কষ্টিপাথরে যারা হকপন্থী, তারাই হকপন্থী। আর হকপন্থীর সংখ্যা কমই হয়ে থাকে; যেমন কুরআন-হাদীসে সে কথার বহু প্রমাণ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

সেই জামাআতই হল 'ফির্কাহ নাজিয়াহ ও ত্বায়েফাহ মানসূরাহ'। এই দলের ব্যাপারেই প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম)*

দ্বিতীয়তঃ তিনি না জেনেই কয়েকটা ওয়াহাবী-বিরোধী বই পড়ে অজানা একটি জামাআতের সমালোচনা করতে গিয়ে তার ইতিহাস আবিষ্কার করার অপচেষ্টা করেছেন। আর এতে তিনি নিজের কূপমন্ডুকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'এই ফেরকার জন্মদাতা হলো একমাত্র ইংরেজি হুকুমত।' আবার পূর্বে লিখেছেন, 'সারা পৃথিবীর মধ্যে ফেরকা আহলে হাদীস গয়ের মকাল্লিদীনের অজুদ ও নাম নিসানা পরিপূর্ণভাবে না পূর্বে ছিল আর না এখনও আছে।'

তার মানে বর্তমানে যেমন পরিপূর্ণভাবে আহলে হাদীসের নাম-নিশানা নেই, তেমনি পূর্বেও পরিপূর্ণভাবে ছিল না। তবে অপরিপূর্ণভাবে ছিল, যেমন এখন আছে। আর সত্যিই ছিল। আর তার মানেই 'এই ফেরকার জন্মদাতা হলো একমাত্র ইংরেজি হুকুমত' এবং 'বর্তমান যুগে যে সব

মানুষ নিজেকে আহলে হাদীস গয়ের মুকাল্লিদ বলে গর্বিত তারা নিশ্চিত সেই কুখ্যাত বেইমান ইংরেজদের রুহানি সন্তান ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই' কথাটি মুফতী সাহেবের ধারণাপ্রসূত গায়ের ঝালঝাড়া পচা কথা। অবশ্য যদি 'আহলে হাদীস' নামক সংগঠনের কথা বুঝান, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

আবার তিনি বলেছেন, 'কেবল মাত্র হিন্দুস্থান পাকিস্থান এবং বাংলাদেশে কিছু কিছু দেখা যায়।' বাকী ত্রিভুবন ঘুরেও তিনি কোথাও আহলে হাদীসের নাম ও নিশানা দেখতে পাননি।

জ্ঞানী পাঠক! এখান থেকেও মুফতী সাহেবের অভিজ্ঞতার দৌড় আপনি আন্দাজ করতে পারেন। তিনি আসলে কোন কোন অন্ধপক্ষপাতগ্রস্ত কিছু লেখকের ইতিহাস পড়ে ধোঁকা খেয়েছেন।

আসলে আহলে হাদীস যে মুহাদ্দিসীনদের একটি মানহাজ ও তাক্বলীদ-বর্জিত ইসলামের নাম---তা তাঁর জানা উচিত ছিল। সে জামাআত পূর্বেও ছিল, পরেও ছিল, তাক্বলীদের উপর তথাকথিত ইজমা' হওয়ার সময় সে জামাআত ইজমা' গন্ডির বাইরে ছিল। অপরিপূর্ণভাবেই ছিল, কিন্তু ছিল। সংখ্যায় কম হলেই কোন কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন সংখ্যালঘিষ্ঠতা 'হক্ব' না হওয়ার দলীল মানা যায় না। আর এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

সারা বিশ্বে ইসলামের সেই মূল স্রোতধারা বিভিন্ন নামে প্রবহমান আছে। কোথাও আনসারুস সুন্নাহ, কোথাও আস্-সালাফিয়্যাহ, কোথাও অন্য নামে একই আক্বীদা ও মানহাজের মুসলিম সজাগ রয়েছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ আসার পূর্বে আহলে হাদীস মানহাজের লোক ছিল। অবশ্য সে চর্চা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ)এর যুগ থেকে লেখালিখির মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। আর সে কথা 'সাবীলুর রাশাদ' নামক গ্রন্থ থেকে মুফতী সাহেব নিজেই উদ্ধৃত করেছেন।

তাদের প্রসিদ্ধ কোন মাদ্রাসা, স্মৃতিচিহ্ন বা প্রণীত বই-পুস্তক যদি না-ই থাকে, তাহলে কী তাদের 'অজুদ' ছিল না? মুফতী সাহেব এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে মানুষকে কী বুঝাতে চেয়েছেন? হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা 'ভুঁইফোঁড়' বহিরাগত। আরে মযহাবই তো পরবর্তী কালের আসা। ভারতবর্ষে ইসলাম এসেছে আরব দেশ থেকে। হানাফী ইত্যাদি মযহাবও এসেছে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর বহু পরে। তাতে কী হয়েছে। আমরা তো সাহাবা-তাবেঈন, আয়েম্মায়ে আরবাআহ সহ অন্য সকল আহলে সুন্নাহর ইমাম ও মুহাদ্দিসীনদেরকে গায়র মুক্বাল্লিদ মনে করি। আমাদের এ

মনে করা কি ভুল মুফতী সাহেব?

আপনি আহলে হাদীস আলেমদেরকে 'ইংরেজদের শির্ষস্থানীয় চামচা' বলে গালি দিয়েছেন। অথচ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং 'ওয়াহাবী আন্দোলন' ক'রে ভারতের স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরাও। হায়রে মযহাবী অন্ধপক্ষপাতিত্বের নেশা! শাবাশি তোমাকে! নেশার ঘোরে সঠিক ও ন্যায্য কথাটি বলতেও বিবেক সায় দেয় না?

ভারতে আহলে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেব বলেন,

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত উপ-মহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে আরব বণিকদের মাধ্যমে, এসব এলাকায় বসতি স্থাপনকারী আরব মুসলিমদের মাধ্যম্যে, খিলাফতে রাশিদার সময় হতে ক্রমাগত রাজনৈতিক অভিযানসমূহের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে আগত ছাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈ বিদ্বানদের নিরন্তর দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে। সেই হতে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে এবং বহুগণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও তাদের আকীদা ও আমলে এসেছে বহু পরিবর্তন, কুরআন ও সুন্নাহর স্বচ্ছ সলিলে ঘটেছে বহু মতের সংমিশ্রণ।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন ইসলামের বাস্তব নমুনা। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁদের জীবন পরিচালিত হত। পরবর্তী যুগে সৃষ্ট মাযহাবী দলাদলী হতে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। উদ্ভূত কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা কুরআন-হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত তালাশ করতেন। না পেলে ছাহাবাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা) অনুসন্ধান করতেন। সেখানেও না পাওয়া গেলে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে 'ইজতিহাদ' করতেন। পরবর্তীতে কোন ছহীহ হাদীছ অবগত হলে ইতিপূর্বেকার গৃহীত ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত বা দলীয় যিদ ও অহমিকা তাঁদেরকে হাদীছের অনুসরণ হতে বিরত রাখতে পারত না। তাঁরা ছিলেন সুন্নাতের হেফাযতকারী, হাদীছের প্রচারক ও নিরপেক্ষ অনুসারী। তাঁরা হাদীছের প্রচলিত ও প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতেন। কোনরূপ দূরতম সম্ভাবনা ব্যক্ত করে 'তাবীল'-এর আশ্রয় নিতেন না। মোট কথা জীবন সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীছ হতে গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা সদা সচেষ্ট থাকতেন। আর এ জন্য তাঁরা যথার্থভাবে নিজেদেরকে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত করতেন এবং প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষার্ধে সৃষ্ট খারেজী, শী'আ, মুর্জিয়া, জাবরিয়া, ক্বাদারিয়া প্রভৃতি বিদআতী ফির্কাসমূহ হতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

করতেন। তাবে-তাবেঈগণও এই তরীকার অনুসারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য---'শ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের---।' ছাহাবীদের যুগ ১০০ বা ১১০ হিজরী, তাবেঈনদের যুগ ১৮০, তাবে-তাবেঈদের যুগ ছিল ২২০ হিজরী পর্যন্ত। *(ফাতহুল বারী ১৪/৩২৩)*

এ কথা বলা চলে যে, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের স্বর্ণযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের হাতে বিজিত এলাকাসমূহের মুসলিমগণ তাঁদের ন্যায় 'আহলুল হাদীছ' ছিলেন। পরবর্তীতে বহু রাজনৈতিক চাপ ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও পঞ্চম শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহর ও এলাকাসমূহে 'আহলুল হাদীছ' নামেই তাদের বসবাস যে উল্লেখযোগ্য হারে ছিল তা মাকদেসীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও আব্দুল কাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯/১০৩৭ খৃঃ)-এর বক্তব্যে বিবৃত হয়েছে। *(আহলেহাদীছ আন্দোলন ২০৩-২০৪পৃঃ)*

হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের দু'জন খ্যাতনামা মুসলিম ভূ-পর্যটক ও ঐতিহাসিকের ভ্রমণ প্রতিবেদন থেকেও তৎকালীন সময়ে 'আহলেহাদীছ' নামে জামাআতে আহলেহাদীছ-এর অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া চলে। চতুর্থ শতকের ভূ-পর্যটক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী আল-মাকদেসী (মৃঃ ৩৭৫ হিঃ) আরব উপদ্বীপ হ'তে শুরু করে তৎকালীন পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে مذاهبهم শীর্ষক বিশেষ শিরোনামে সেখানকার মাযহাবী চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি প্রচলিত মাযহাব চতুষ্টয় ও অন্যান্য মাযহাব-সহ 'আহলেহাদীছ'কে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলে আসেন। সে এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের মাযহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেখানকার অধিকাংশ মুসলিম "আছহাবে হাদীছ"। আমি কাযী আবূ মুহাম্মাদ মানছুরী নামে দাউদী (যাহেরী) মাযহাবের একজন নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতকে দেখলাম। তিনি সেখানে দারস দিয়ে থাকেন। তিনি অনেক সুন্দর গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। মুলতানের অধিবাসীরা শীআ মতাবলম্বী....। সকল শহরেই কিছু কিছু হানাফী ফকীহ রয়েছেন। এখানে মালেকী বা মু'তাযেলী কেউ নেই, হাম্বলী মাযহাবের উপরেও কোন আমল নেই। *(আহসানুত তাকাসীম ৪৮১পৃঃ, ঐ ৬০-৬১পৃঃ)*

ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও তাঁদের অনুসারী মুহাদ্দিছ উলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমেই পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। তাঁদের হাতে ইসলাম ছিল তার নিজস্বরূপে দীপ্যমান। সেই সময়ে আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে যে ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরে ও ব্যবসা কেন্দ্রে প্রচারিত হয়। তাও ছিল নির্ভেজাল এবং ছাহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানদের আদর্শপুত। কুরআন ব্যতীত তাঁদের সম্মুখে আর কোন গ্রন্থ ছিল না। রাসূল ও ছাহাবীদের আদর্শ ব্যতীত তাঁদের নিকটে আর কোন আদর্শ ছিল না। তাঁদের মাধ্যমে এ দেশে কুরআন ও হাদীছের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তাঁদের হাতেই ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ায় 'আহলেহাদীছ' আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছে। তাঁদের ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে মাত্র ৭০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন কাসেম (৬৬-৯৬ হিঃ) যখন সিন্ধু আসেন, তখন মুসলিম জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেবল মুলতানেই পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের একটি বহর নিয়োগ করতে হয়। এতদ্ব্যতীত মানসূরা, আলোর প্রভৃতি শহরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সামরিক কেন্দ্র ছিল। এইভাবে মানসূরা, মুলতান, সিন্দান, কুছদার (বেলুচিস্তান) কান্দাবিল প্রভৃতি স্থানগুলি কেবল মাত্র আরব বসতি কেন্দ্র ছিল না, বরং কুরআন হাদীছের প্রার্থমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও মর্যাদাপূর্ণ ছিল। *(আহলেহাদীছ আন্দোলন ২০৪-২০৫পৃঃ)*

আর মুফতী সাহেব 'আহলে হাদীসের জন্মদাতা ইংরেজ' বলবেন না কেন? দেওবন্দী ফির্কা সম্বন্ধেও যে বলা হয়েছে, 'চাওদাহবী স্বদী হিজরী মেঁ তাওয়াল্লুদ-পযীর হোনে-ওয়ালা ফির্কাহ দেওবান্দিয়্যাহ.........ফির্কা মুর্জিয়াহ অজাহমিয়্যাহ অমু'তাযিলাহ অহিন্দু মযহাব কে তাস্বাউউফ আওর আপনে অলিয়ে নে'মাত আঙ্গরেজ কী সাজিশ কে মাজমূআহ মালগূবাহ সে ইস ফির্কে কা যুহূর হুয়া।' *(মাজমূআহ মাক্বালাত, মুহাম্মাদ রঈস নদবী ৮০২পৃঃ)* সুতরাং বদলা তো নিতেই হবে।

'ফেকাহ' কী?

মুফতী সাহেব (৩১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'ফেকাহ কুরান এবং হাদীস ব্যতিত কোনো নতুন জিনিসের নাম নয়।'

তারপর আবার লিখছেন, 'এটা কোনো আবশ্যক নয় যে, ফেকার প্রত্যেকটি মসলা কুরান পাকের আয়াত বা হাদীস হবে।'

কিন্তু এটা তো আবশ্যক যে, 'ফেকাহ' কোন আয়াত বা হাদীসের বিরোধী

হবে না এবং বিরোধী হলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশই আমলযোগ্য হবে, 'ফেকাহ' নয়।

পরন্তু ইনকারে হাদীস ও ইনকারে ফিক্বহ এক জিনিস নয়। সঠিক ফিক্বহকে কোন আলেম অস্বীকার করতে পারেন না। অস্বীকার করেন কেবল সহীহ হাদীস-বিরোধী ফিক্বহকে।

হাদীস দ্বিতীয় অহী। ফিক্বহ তৃতীয় অহী নয়। সুতরাং কেন এই তুলনা দিয়ে 'আল-হিদায়াহ কালক্বুরআন'-এর মতো তালগোল পাকানো?

পুনরায় আল-ক্বুরআনের 'মুহকাম' ও মুতাশাবিহ' আয়াতের সাথে তুলনা দিয়ে ফিক্বহের 'মুফতা বিহি' ও 'গায়র মুফতা বিহি' মসলার কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, 'গায়র মুফতা বিহি' হল কাঁচা মসলা। সে মসলাগুলো 'ফেকাহ' বলে হানাফীরা মানেন না। আর সেই 'ফেকাহ' নিয়েই তাঁদের সাথে আহলে হাদীসদের দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন। বাকী 'মুফতা বিহি' মসলা সব কুরআন-হাদীসের মসলা। তবুও কেন আপত্তি?

প্রথম আপত্তি, যে মসলা সহীহ হাদীসকে ভিত্তি ক'রে নয়, সে ফিক্বহকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি, ইমামের ম্যাধমে কুরআন-হাদীস বুঝব, কিন্তু কেবল একটা ইমামের মাধ্যমে কেন?

দেহলবী সাহেবের যে উক্তি পেশ করেছেন,

ما اقتدينا بإمامنا إلا لعلمنا أنه أعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. (حجة الله البالغة)

আমাদের কাছে যে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ' রয়েছে, তাতে এ উক্তি পেলাম না। থাকলে অন্য কোন কিতাবে থাকতে পারে।

অথচ তাঁর তাক্বলীদ সম্বন্ধে উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। আর তাঁর অন্য এক উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া তিনি বলেছেন, 'আমরা আমাদের ইমামের কেবল এই জন্য অনুসরণ করি যে, তিনি কুরআন-হাদীস সম্পর্কে আমাদের থেকে অধিক জ্ঞান রাখেন।'

তিনি এ কথা বলেননি যে, 'তিনি কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সকল ইমামের থেকে অধিক জ্ঞান রাখেন।'

নামাযে ইমামের ইক্বতিদা করা এবং দ্বীনী ফায়সালায় নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদ করা কি এক হল মুফতী সাহেব? নামাযের ইক্বতিদা করার তো দলীল আছে। তাক্বলীদের তো কোন দলীল নেই। বরং আয়েম্মায়ে কেরাম তাক্বলীদ করতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

তাছাড়া নামাযের ইক্বতিদা তো যে কোন ইমামের করলে হয়ে যাবে? আপনাদের তাক্বলীদ কি হবে? আপনারা ইজমার সাথে যে তাক্বলীদকে ওয়াজেব বলেন, সে তাক্বলীদকে অন্য উলামাগণ যে হারাম বলেন।

اتِّخَاذُ أَقْوَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ بِمَنْزِلَةِ نُصُوصِ الشَّارِعِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلٍ سِوَاهُ ، بَلْ لَا إِلَى نُصُوصِ الشَّارِعِ ، إِلَّا إِذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلِهِ ، قَالَ فَهَذَا هُوَ التَّقْلِيدُ الَّذِي أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْأُمَّةِ إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ.

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির উক্তিসমূহকে শরীয়তের স্পষ্ট উক্তির মর্যাদা দান করা এবং তিনি ছাড়া অন্য কারোর উক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, বরং তাঁর উক্তির মোতাবেক না হলে শরীয়তের উক্তির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করা। এই হল সেই তাক্বলীদ, যার ব্যাপারে উম্মত একমত যে, তা আল্লাহর দ্বীনে হারাম। আর সে তাক্বলীদ মাহাত্ম্যপূর্ণ শতাব্দিসমূহের অতিক্রান্ত হওয়ার পরই প্রকাশ লাভ করেছে। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৬৫)*

নামাযে ইমাম সাহেব ভুল করলে লুক্বমা দিয়ে সংশোধন করা যাবে। আর চার রাকআতের জায়গায় পাঁচ রাকআত পড়লে ইমামের অনুসরণ করা যাবে না। আপনাদের তাক্বলীদে তো তা নয়।

নামাযের ইমামের ইক্বতিদা ও ইত্তিবা' হয়। আহলে হাদীস ইত্তিবা' তো মানে। মহান আল্লাহর পূর্বোক্ত নির্দেশের উপর আমল ক'রে যে ইমামের অভিমতটি অধিক বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত সেটারই অনুসরণ করে। তাহলে এ চুনে-দইয়ে একাকার ক'রে আপনার কল্পিত আহলে হাদীসকে ধোঁকায় ফেলে বোকা বানাচ্ছেন কেন?

মুফতী সাহেব চমৎকার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইমাম আবূ হানিফাকে মানলে শেরেক হয় তবে চার জন ইমামকে মানলে চার গুণ শেরেক হবে।' অর্থাৎ আহলে হাদীসদের প্রতিপাদন অনুযায়ী যদি কোন ইমামের তাক্বলীদ শির্ক হয়, তাহলে একাধিক ইমামের তাক্বলীদ করলে একাধিক শির্ক হবে। সুতরাং একটা শির্ক করাই ভাল।

আসলে শির্ক কখন হয়, তা আপনার ঐ কল্পিত গায়র মুক্বাল্লিদও জানে না। সুতরাং তা দেহলবী (রঃ)এর ভাষায় শুনুন,

وفيمن يكون عامياً ، ويقلد رجلاً من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ ، وأن ما قاله هو الصواب البتة ، ويضمر في قلبه ألا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه ، وذلك ما رواه الترمذي

عن عدي بن حاتم أنه قال : سمعته ـ يعني رسول الله ﷺ ـ يقرأ : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } . قال : « إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه » . . . ،

وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلاً فقيهاً شافعياً وبالعكس ، ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلاً ، فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى ، وناقض الصحابة والتابعين .

من كان ذا بصيرة واتبع عالماً راشداً :

وليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي ﷺ ، ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحله الله ورسوله ، ولا حراماً إلا ما حرمه الله ورسوله ، لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبي ﷺ ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ، ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالماً راشدا على أنه مصيب فيما يقول ، ويفتي ظاهراً متبع سنة رسول الله ﷺ فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار ، فهذا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي ﷺ : ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائماً ، أو يستفتي هذا حينا وذلك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه .

كيف لا ولم نؤمن بفقيه أيا كان أنه أوحى الله إليه الفقه ، وفرض علينا طاعته ، وأنه معصوم ، فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله ، فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة ، أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط ، أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوطة بعلة كذا ، واطمأن قلبه بتلك المعرفة ، فقاس غير المنصوص على

المنصوص ، فكأنه يقول : ظننت أن رسول الله ﷺ قال : - كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا – والمقيس مندرج في هذا العموم ، فهذا أيضاً معزي إلى النبي ﷺ ، ولكن في طريقه ظنون ، ولولا ذلك لما قلد مؤمن بمجتهد ، فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه ، وتركنا حديثه ، واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا ، وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين . حجة الله البالغة – (١ / ٣٣٥- ٣٣٦)

অর্থাৎ, যে সাধারণ লোক হবে এবং নির্দিষ্ট কোন এক ফকীহর তাক্বলীদ করবে। সে মনে করবে যে, তাঁর মতো ব্যক্তির ভুল হওয়া অসম্ভব এবং তিনি যা বলেছেন, তাই নিশ্চিত সঠিক। আর নিজ অন্তরে এ কথা গোপন রাখবে যে, তাঁর কথার বিপরীত কোন দলীল প্রকাশ পেলেও সে তাঁর তাক্বলীদ বর্জন করবে না। (তার জন্য প্রযোজ্য) তিরমিযীর বর্ণিত আদী বিন হাতেমের হাদীস, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে, যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির (শির্ক) করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহ ঃ ৩১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “তারা তাদের পূজা করত না। কিন্তু যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল করত, তখন তারা তা হালাল গণ্য করত এবং যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হারাম করত, তখন তারা তা হারাম গণ্য করত।”

আর এ (হাদীস) তার জন্যও প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি---উদাহরণস্বরূপ---কোন হানাফীর জন্য শাফেয়ী ফকীহর কাছে অথবা কোন শাফেয়ীর জন্য

হানাফী ফকীহর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা বৈধ মনে করে না। যেমন হানাফীর জন্য ইমাম শাফেয়ীর অনুসরণ বৈধ মনে করে না। এমন ব্যক্তি প্রাথমিক শতাব্দিগুলির সর্বসম্মতি (ইজমা’)র বিরোধিতা করে এবং সাহাবা ও তাবেঈনের বিপরীত পথে চলে।

যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং কোন হক্কানী আলেমের ইত্তিবা’ (অনুসরণ) করে ঃ

উক্ত হাদীস সেই ব্যক্তির উপর আরোপ হবে না, যে নবী ﷺ-এর উক্তি ছাড়া অন্য কারো উক্তিকে দ্বীন মনে করে না, আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হালাল করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুকে হালাল জ্ঞান করে না এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হারাম করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুকে হারাম জ্ঞান করে না। কিন্তু যখন তার কাছে নবী ﷺ-এর উক্তির ইল্ম থাকে না, তাঁর বিভিন্নমুখী উক্তির মাঝে সমন্বয় সাধন করার পদ্ধতি-জ্ঞান থাকে না এবং তাঁর উক্তি থেকে বিধান গ্রহণ করার পদ্ধতি-জ্ঞান থাকে না, তখন সে কোন হক্কানী আলেমের ইত্তিবা’ করে এই ভেবে যে, তাঁর কথা সঠিক এবং তিনি বাহ্যতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ ক’রে ফতোয়া দেন। অতঃপর যখন তিনি তার ধারণার বিপরীত করেন, তখনই সে তর্ক না ক’রে ও অটল না থেকে (তাঁর অনুসরণ থেকে) বিরত হয়। এ ব্যাপারে কেউ কীভাবে আপত্তি করতে পারে? অথচ ফতোয়া চাওয়া ও দেওয়া নবী ﷺ-এর যুগ থেকেই বর্তমান আছে। আর এতে কোন পার্থক্য নেই যে, সে এঁর কাছে সর্বদা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে অথবা এঁর কাছে কোন সময়ে এবং ওঁর কাছে কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করবে, যখন সে আমাদের উল্লিখিত বিষয়ে একমত হবে।

কেন নয়? আমরা কোন ফক্বীহর জন্য---তাতে তিনি যিনিই হন---এ বিশ্বাস রাখি না যে, আল্লাহ তাঁর প্রতি ফিক্বহ অহী করেছেন এবং তিনি আমাদের উপর তাঁর আনুগত্য ফরয করেছেন এবং তিনি ত্রুটিমুক্ত। অতঃপর আমরা যদি তাঁদের মধ্যে কারো অনুসরণ করি, তাহলে তা আমাদের এই জ্ঞানের জন্য যে, তিনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর আলেম। সুতরাং তাঁর উক্তি এ থেকে শূন্য হয় না যে, হয় তাঁর উক্তি কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তি হবে। অথবা বিধান গ্রহণের কোন পদ্ধতিতে তা উভয় থেকে নিঃসারিত হবে। অথবা বর্ণনাপ্রসঙ্গ দ্বারা জানবে যে, অমুক অবস্থায় বিধানটি অমুক হেতু-সাপেক্ষ। এই জানাতে তাঁর মন নিশ্চিত হবে। অতঃপর তিনি যে বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি নেই, সেই বিষয়কে তার উপর কিয়াস করবেন, যে বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি আছে। সুতরাং তিনি যেন বলছেন, ‘আমার মনে হয়, আল্লাহর রসূল ﷺ এই বলেছেন।’ যখনই এই

হেতু পাওয়া যাবে, তখনই তার বিধান এই। যা কিয়াস করা হয়, তা এই ব্যাপক নীতির অন্তর্ভূত হবে। এটাও নবী ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত হবে, তবে তার পথে রয়েছে অনুমান ও ধারণা। তা না হলে কোন মু'মিন কোন মুজতাহিদের তাক্বলীদ করত না। অতঃপর যদি আমাদের নিকট ত্রুটিমুক্ত রাসূলের নিকট থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে কোন হাদীস আসে, যাঁর আনুগত্য আল্লাহ আমাদের জন্য ফরয করেছেন, যে হাদীস ঐ আলেমের মযহাবের বিপরীত কিছু নির্দেশ করে, অথচ আমরা তাঁর হাদীস বর্জন করি এবং ঐ অনুমান ও ধারণার অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের চাইতে বড় যালেম আর কে? সেদিন আমাদের কী ওজর থাকবে, যেদিন মানুষ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে? *(হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ ১/৩৩৫-৩৩৬)*

মুফতী সাহেবের কল্পিত আহলে হাদীসটি সত্যিই বোকা! তাছাড়া আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা নিজেদেরকে হানাফি বলেন কেন?'

আরে! ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর একনিষ্ঠ মুক্বাল্লিদরা নিজেদেরকে 'হানাফী' বলবেন না তো আর কী বলবেন? ঈসায়ীদেরও ঐ শ্রেণীর পরিচায়ক নাম আছে। তাদের কেউ প্রোটেস্টান্ট, কেউ ক্যাথলিক ইত্যাদি। আর মুফতী সাহেবের মতো হানাফীরা সেই শ্রেণীর তাক্বলীদ না করলেও, খ্রিষ্টানরা কিন্তু করত, যেমন দেহলবী (রঃ)এর উক্তিকে স্পষ্ট হয়েছে।

চার মযহাবের মুক্বাল্লিদগণকে আহলে সুন্নাহ অল-জামাআত থেকে বের করার দায়িত্ব আমাদের নয়। তবে আহলে হাদীসরাই যে প্রকৃত আহলে সুন্নাহ---সে কথা হঠকারী ছাড়া আর কেউ অমান্য করতে পারে না। যেহেতু সুন্নাহ মানেই নবীর তরীকা এবং হাদীস। আর আহলে হাদীস থেকে অন্য কেউ সুন্নাহ ও হাদীসকে বেশি ভালোবাসে না ও বেশি মান্য করে না।

'যবের দানা সমতুল্য দাড়ি' কি আপনাদের কারো নেই? যাঁরা নিজেদের বগলে গন্ধ চাপা রেখে 'আতর আলী' নাম নিয়ে পরের বগলের গন্ধ শুঁকতে যান, তাঁদের তো ভেবে দেখা উচিত যে, হাদীস বাইরের কর্ম তো কর্তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন হানাফী আলেম কি আদর্শচ্যুত নেই? তাহলে জামাআতের বিচার করতে গিয়ে ব্যক্তি-বিচার কেন? যদি হানাফী কোন আলেম ব্যভিচার করেন, তাহলে তার হিসাব কি মুফতী সাহেব দেবেন?

আরো জেনে রাখুন, আহলে হাদীস উলামার মতে দাড়ি সুন্নত নয়, (কম-সে-কম এক মুষ্ঠি) দাড়ি রাখা ওয়াজেব। (অসভ্য না লাগলে) না ছেঁটে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব। কেউ ওয়াজেব না মানলে গোনাহগার হবে। কিন্তু তার জন্য অন্য কেউ বা জামাআত দায়ী হবে কেন?

মুফতী সাহেব (৪০পৃষ্ঠায়) তাঁর গায়র মুক্বাল্লিদ আহলে হাদীসের সামনে

দাবী করেছেন, 'হুজুর আমাদের নাম আহলে সুন্যত ওলজামায়াত রেখেছেন।'

'আমাদের' বলতে 'মুক্বাল্লিদদের'। অর্থাৎ হুজুর (মানে রসূল ﷺ) বলেছেন, 'যারা কোন নির্দিষ্ট এক ইমামের অন্ধ অনুকরণ ক'রে আমার সুন্নত মানবে, তারাই 'আহলে সুন্যত ওলজামায়াত।'

মুফতী সাহেব তার দলীল দেখিয়েছেন তফসীর দুর্রে মানষূর ও ইবনে কাষীরের একটি হাদীসে।

{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (١٠٦)

سورة آل عمران

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে। যাদের মুখমন্ডল কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা অবিশ্বাস করার পরিণামে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। *(আলে ইমরান ঃ ১০৬)*

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'এই আয়েতের তফসীরে হুজুর বলেছেন, যাদের মুখমণ্ডল কেয়ামতের দিবসে উজ্জ্বল হবে চমকাবে, তারা হল আহলে সুন্নত ওলজামায়াত।'

সুধী পাঠক! মুফতী সাহেবের উদ্ধৃত হাদীসটি ভাল ক'রে পাঠ করুন এবং ঈমানদারীর সাথে বলুন, উক্ত হাদীসে কি 'মুক্বাল্লিদ' বা 'হানাফী' শব্দ আছে? তিনি এখান হতে কীভাবে দাবী ক'রে বসলেন যে, মুক্বাল্লিদদের মুখমণ্ডল কিয়ামত দিবসে চমকাবে এবং হুজুর তাঁদের নাম 'আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ' দিয়েছেন? এটা কি অতিরিক্ত দাবী নয়?

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করুন, তফসীরে ইবনে কাষীরে যা আছে, তা নিম্নরূপ ঃ-

وقوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} يعني يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

অর্থাৎ, উক্ত কথাটি ইবনে আব্বাস বলেছেন। *(ইবনে কাষীর ১/৪৭৯)*

তাও তা 'সহীহ নয়' বলে উলামাগণের মন্তব্য রয়েছে। সুতরাং 'দুর্রে মানষূর' প্রভৃতির বর্ণনা অনুসারে নবী ﷺ উক্ত কথা বলেছেন প্রমাণ করা আরো দুরূহ ব্যাপার।

তাছাড়া উক্ত হাদীস সহীহ হলেও এ কথা সেই সময়কার কথা, যখন

বিতর্কিত তাক্বলীদ পয়দাও হয়নি। সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগেও আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ ছিল, যে নামে ইসলামের মৌলিক ঐ জামাআতকে খাওয়ারিজ, রাফেযাহ, ক্বাদারিয়্যাহ ইত্যাদি থেকে পৃথক ক'রে চেনা যেতো। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন,

ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، هم سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم بإحسان). "الفتاوى" (٢٤١/٢٤)

অর্থাৎ, আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের মযহাব পুরনো মযহাব। যা আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদকে আল্লাহর সৃষ্টি করার পূর্বেই পরিচিত ছিল। যেহেতু তা হল সেই সাহাবার মযহাব, যাঁরা তা তাঁদের নবীর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি এ মযহাবের বিরোধিতা করবে, সে আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের নিকট 'বিদআতী' গণ্য হবে। আহলুস সুন্নাতি অল-জামাআহ উম্মতের সলফ ও তার ইমামগণ এবং তারাও, যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করে। *(মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ ২/৬০১, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৪/২৪১)*

বিশিষ্ট তাবেঈ ইবনে সীরীন বলেন,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

অর্থাৎ, লোকে (হাদীস গ্রহণে) সনদ জিজ্ঞাসা করত না। অতঃপর যখন ফিতনা প্রাদুর্ভূত হল, তখন বলল, 'তোমরা তোমাদের (বর্ণনাকারী) রিজালের নাম বল।' সুতরাং 'আহলে সুন্নাহ' দেখা গেলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো এবং 'আহলে বিদআহ' দেখা গেলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো না। *(মুসলিমের ভূমিকা)*

সুতরাং আহলে সুন্নাহর মযহাবই আসল ইসলাম। সেই মযহাবই হল 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' (সরল পথ), যে পথে চলতে মুসলিমরা আদিষ্ট হয়েছে এবং যে পথে চলার তওফীক কামনা ক'রে প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে প্রার্থনা ক'রে থাকে।

শায়খুল ইসলাম বলেন,

وهذا "الصراط المستقيم" هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو (السنة والجماعة) فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض). "الفتاوى" (٣٦٩/٣)

অর্থাৎ, এই 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' কেবল দ্বীনে ইসলামই। আর তা হল সেই জিনিস, যা আল্লাহ তাআলার কিতাবে আছে। আর তা হল 'আস-সুন্নাহ অল-জামাআহ'। যেহেতু আসল 'সুন্নাহ' হল, আসল 'দ্বীনে ইসলাম'। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/৩৬৯)*

তিনি আরো বলেছেন, 'আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহ' বলতে উদ্দেশ্য বিশেষ পরিভাষা। যেহেতু 'আহলে সুন্নাহ' শব্দের রয়েছে দু'টি পরিভাষা; একটি আম ও অপরটি খাস।

বিশেষ পরিভাষায় আহলে সুন্নাহ হল খাঁটি আহলুল হাদীস অস্সুন্নাহ। সুতরাং এই পরিভাষায় কেবল তারা প্রবেশ করবে, যারা মহান আল্লাহর 'স্বিফাত' (গুণাবলী) বিশ্বাস করবে এবং বলবে, 'কুরআন সৃষ্টি নয়, আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে।' তক্বদীর বিশ্বাস করবে এবং আরোও অন্যান্য মৌল আক্বীদায় বিশ্বাসী হবে, যা আহলে হাদীস ও সুন্নাহর নিকটে পরিচিত।

আর আম পরিভাষায়---যা সাধারণ লোকেদের পরিভাষায় প্রসিদ্ধ, তা হল প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে রাফেযী (বা শিয়া) নয়, সেই আহলে সুন্নাহ। *(মিনহাজুস সুন্নাহ ২/২২১)*

অবশ্য আহলে হাদীস উলামা চার মযহাবকেও আহলে সুন্নাহ বলে স্বীকার করেন। তবে কেউ কোন অতিরিক্ত নির্দিষ্ট কারণে খারিজ করলেও ক'রে থাকতে পারেন। যেমন কোন আহলে হাদীস কোন শির্ক বা বিদআতে মুকাফ্ফিরার শিকার হলে, তিন তাওহীদের কোন একটিকে অমান্য ক'রে বসলে সেও 'আহলে সুন্নাহ' থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেমন দেওবন্দী দাবী করেন, তিনি আহলে সুন্নত, তেমনি বেরেলবীও দাবী করেন, তিনিই আহলে সুন্নত। অথচ উভয়ের মাঝে কত পার্থক্য, তা মুফতী সাহেবের অজানা নয়।

হ্যাঁ, হাদীসের কিতাবসমূহে 'আহলুল হাদীস' মানে ফিক্বহ অস্বীকারকারী নয় মুফতী সাহেব। 'আহলুল হাদীস' বা 'আসহাবুল হাদীস' তাঁরা যাঁরা 'আসহাবুর রায়' নন। অর্থাৎ, হাদীসের উপর রায় ও কিয়াসকে প্রাধান্য দেন না।

আহলুল হাদীস তাঁরা, যাঁরা হাদীস বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন এবং তার উপর আমল ক'রে থাকেন। আর নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদ বর্জন ক'রে হাদীসের উপর আমল করেন বলেই তাঁরা গায়র মুক্বাল্লিদ হন।

عن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله ﷺ أوصانا رسول الله ﷺ أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا.

আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ যখন (নিজের মজলিসে) যুবকদেরকে দেখতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অসিয়তকে স্বাগতম!' আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে অসিয়ত করেছেন যে, আমরা যেন তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত ক'রে (জায়গা) দিই এবং তোমাদেরকে হাদীস বুঝিয়ে দিই। যেহেতু তোমরা আমাদের উত্তরসূরি এবং আমাদের পরে 'আহলে হাদীস'। *(শারাফু আহলিল হাদীস ১/২২)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

ইমাম বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, উক্ত জাতি হল তারা, যাদের কথা (পূর্বোক্ত) হাদীসে বলা হয়েছে।

উলামাগণ বলেন, সেই দলের নাম হল 'আহলে হাদীস।'

কিন্তু বিরোধীরা বলতে পারেন, 'তা কেন?'

তার কারণ বর্ণনা ক'রে বলা যায় যে,

প্রথমতঃ আহলে হাদীসরাই বিশেষভাবে সুন্নাহ অধ্যয়ন করেন, হাদীসের সনদ সংক্রান্ত নানা জ্ঞানচর্চা তাঁরাই করেন, তাঁরাই অন্যান্য ফির্কার তুলনায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তরীকা, নির্দেশ, চরিত্র, জিহাদ ইত্যাদি বিষয় বেশী জানেন।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মাহ নানা ফির্কা ও মযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক মযহাবের রয়েছে উসূল ও ফুরু (মৌল ও গৌণ নীতিমালা)। মযহাবীদের আছে নির্দিষ্ট কতকগুলি হাদীস, যা তাঁরা দলীলরূপে পেশ করেন ও তার ওপর নির্ভর করেন। তাঁরা একটি মযহাবের অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্ব করেন ও তাতে যা আছে কেবল তাই মজবুতভাবে ধারণ করেন। অন্য কোন মযহাবের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং তাকিয়েও দেখেন না। আর সম্ভবতঃ অন্য মযহাবে এমন হাদীস আছে, যা তাঁদের অনুকরণীয় মযহাবে নেই। আর এ কথা আহলে ইলমদের নিকটে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মযহাবের কাছে যে সকল হাদীস আছে, তা (অনেকাংশে) অপর মযহাবের নিকট নেই। আর এর ফলে মযহাবধারী অপর মযহাবে বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস থেকে বঞ্চিত থেকে যান। পক্ষান্তরে আহলে হাদীস এমন নন। বরং তাঁরা সেই সকল হাদীস গ্রহণ করেন, যার সনদ সহীহ; তাতে তা যে কোন মযহাবের লোকের কাছে হোক, তার বর্ণনাকারী যে কোন ফির্কার হন; যদি তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলিম হন। হানাফী-মালেকী তো দূরের কথা, বর্ণনাকারী যদিও শিয়া হন অথবা ক্বাদারী অথবা খারেজী, তবুও (সহীহ হলে) তাঁর বর্ণনা গ্রহণ ক'রে থাকেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) একদা ইমাম আহমাদ (রঃ)কে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার চাইতে হাদীস বেশী জানো। সুতরাং তোমাদের কাছে কোন হাদীস সহীহসূত্রে এলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি সেই হাদীস (ওয়ালা)র কাছে যাব, চাহে সে হিজাযী হোক অথবা কূফী হোক অথবা মিসরী হোক।'

বলা বাহুল্য, আহলে হাদীসগণ মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তির অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করেন না। অথচ যাঁরা তাঁদের বিরোধী, যাঁরা আহলে হাদীস নন, যাঁরা হাদীস অনুযায়ী আমল করেন না, তাঁরা তাঁদের ইমামগণের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উক্তির পক্ষপাতিত্ব করেন; যেমন আহলে হাদীসগণ তাঁদের নবীর উক্তির পক্ষপাতিত্ব করেন। আল্লাহ আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের হাশর করুন। আমীন।

সুতরাং উক্ত বয়ানের পর আর কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না যে, 'আহলে হাদীসই কেন তায়েফাহ যাহেরা ও ফির্কাহ নাজিয়াহ?' বরং আহলে হাদীসগণই মধ্যপন্থী উম্মাহ এবং সারা সৃষ্টির জন্য সাক্ষী। *(সিঃ সহীহাহ ১/৮, ১/২৬৯)*

আহলে সুন্নাহ ও আহলে হাদীস এক নয়---মুফতী সাহেবের ধারণা। সুন্নত মানে যদি নবীর তরীকা হয়, তাহলে তা কী হাদীস ছাড়া প্রমাণ হবে?

সুতরাং যে সুন্নত যয়ীফ হাদীস দ্বারা প্রতিপাদিত, তা যয়ীফ সুন্নত। যা জাল হাদীস দিয়ে প্রতিপাদিত, তা জাল সুন্নত। আহলে হাদীস কিন্তু আহলে সহীহ বা হাসান হাদীস। আহলে হাদীস কোন যয়ীফ বা জাল হাদীসের উপর নির্ভর ক'রে মসলা বলে না। হাদীসের সনদ বিতর্কিত হলে সে কথা আলাদা। আপনারাও তো দাবী করেন, আপনারা মুহাম্মাদী। আপনাদের কোন মসলা হাদীসের বিপরীত নয়। যেহেতু আপনাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) সমস্ত হাদীস জানতেন। সকল সহীহ-যয়ীফ জানতেন। আর অন্য কোন ইমাম ততটা জানতেন না। আর এই জন্যই আপনারা তাঁর তাক্বলীদ করেন। পক্ষান্তরে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীকেও আহলে সুন্নত মনে করেন। যদিও অনেক মসলাতে তারা আপনাদের উল্টা। যেহেতু তারা একটি বিষয়ে আপনাদের সাথে একমত যে, তারাও তাদের নিজ নিজ ইমামের অনুরূপ তাক্বলীদ করে। আহলে হাদীসরা আহলে সুন্নত নয়, কারণ তাদের সাথে আপনাদের মসলা মিলে না বলে নয়, বরং তারা কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ করে না এবং হাদীসের উপর রায় বা কিয়াসকে প্রাধান্য দেয় না।

মুফতী সাহেব মুক্বাল্লিদদেরকে 'আহলে সুন্নাহ' বলতে চেষ্টা করেছেন। অথচ আহলে সুন্নাহ তাক্বলীদের পূর্বেও ছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে 'ইমামু আহলিস সুন্নাতি অল-জামাআহ' বলা হতো। যেহেতু আক্বীদার ব্যাপারে আহলে সুন্নাহ ছিল আহলে বিদআহ থেকে পৃথক। আর ঐ আক্বীদায় আহলে হাদীসও শামিল। অবশ্য আহকাম বা জুযয়ী মাসায়েলে তাক্বলীদকে কেন্দ্র ক'রে 'আহলে হাদীস' বা গায়র মুক্বাল্লিদ পৃথক থাকে। সুতরাং মুফতী সাহেবের সমঝ অনুসারে না হলেও আমরা জানি যে, প্রত্যেক আহলে হাদীস আহলে সুন্নাহ। তবে প্রত্যেক আহলে সুন্নাহ আহলে হাদীস নয়।

পক্ষান্তরে 'সুন্নাহ'র এক অর্থ 'হাদীস'। আর সেই অর্থেও 'আহলে হাদীস' যে, 'আহলে সুন্নাহ'ও সে।

আহলে সুন্নাহ ও আহলে হাদীসের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য (৪২-৪৪ পৃষ্ঠায়) মুফতী সাহেব কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ-

১। 'আহলে সুন্নত মানে ইমাম বা মুজতাহিদগণকে তাক্বলীদ। কিন্তু বর্তমান আহলে হাদীস ইমামদের মানাকে শেরেক বলে।'

আহলে সুন্নত (অর্থাৎ, মুক্বাল্লিদ মযহাবীরা) নির্দিষ্ট একটি ইমামের তাক্বলীদ 'ফরয' বলে মানে। আর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আহলে হাদীসরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাক্বলীদকে অবৈধ বলে; যেমন দেহলবী

(রঃ) বলেছেন। কোন আহলে হাদীস প্রয়োজনে কোন মুজতাহিদের ইজতিহাদের 'ইত্তিবা' করাকে হারাম বলেনি। পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম তো করতেই হবে। তবে পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। অজানা-অচেনা জায়গায় কম্পাস দিয়ে ক্বিবলা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সামনে কা'বা দেখা গেলে কম্পাস ব্যবহার করা অবশ্যই অযৌক্তিক।

২। 'আহলে সুন্নত তিন তালাককে তিন বলে মানে। আহলে হাদীসরা শিয়াদের (?) মত এক তালাক বলে মানে।'

এটি দলীলভিত্তিক ইজতিহাদী ব্যাপার।

৩। 'আহলে সুন্নত আল্লাহর অলিদেরকে সম্মান করে। কিন্তু গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস এঁদের দোষ বার করার চেষ্টা করে।'

এটি অনুমান-প্রসূত অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দেখা আমল অনুযায়ী ঐ 'চোর গাঁ'য়ের মতো উচ্চারিত উক্তি। অবশ্য আপনি যাঁকে 'আল্লাহর অলী' মনে করেন, তাঁকে কোন আহলে হাদীস 'অলী' মনে নাও করতে পারে। আবার সম্মান দেওয়ার ধরনেও ভিন্নতা থাকতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে দুই দর্শনে পার্থক্য তো হতেই পারে। নচেৎ কোন আহলে হাদীস বুখারীর এই কুদসী হাদীসকে কি অমান্য করতে পারে?

(مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ....)

"যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

৪। 'আহলে সুন্নত সাহাবাদেরকে হকের মাপকাঠি মনে করে কিন্তু গয়ের মুক্বাল্লিদরা তা মানে না।'

এটিও ভুল ধারণার শিকারগ্রস্তের কথা। আর সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সুধী পাঠক তা অবশ্যই বুঝতে পারেন। অবশ্য আহলে হাদীসরা সকল ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর উক্তিকে সাহাবার উক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন সলফগণ করতেন ঃ-

সঙ্গে কুরবানী না থাকলে আবূ বাক্র ؓ ও উমার ؓ ইফরাদ হজ্জকে উত্তম মনে করতেন। পক্ষান্তরে সহীহ সুন্নাহতে তামাত্তু হজ্জ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। সেই ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস ؓ তামাত্তু হজ্জ উত্তম বলে ফতোয়া দিতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবূ বাক্র ও উমারের কথা বললে তিনি বলেছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ হবে। আমি বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন।' আর তোমরা বলছ, 'আবূ বাক্র ও উমার বলেছেন।'" *(আহমাদ ১/৩৩৭, এর সনদটি দুর্বল। অবশ্য উক্ত অর্থেই সহীহ সনদে*

মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাকে একটি আষার বর্ণিত হয়েছে। দেখুনঃ যাদুল মাআদ ২/১৯৫, ২০৬)

একই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন উমারকে এক ব্যক্তি বলল, 'আপনার আব্বা তো তামাত্তু হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন।' এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর আদেশ অধিক মানার যোগ্য, নাকি আমার আব্বার?' *(যাদুল মাআদ ২/১৯৫)*

ক্বাতাদাহ বলেন, ইবনে সীরীন এক ব্যক্তিকে একটি হাদীস বয়ান করলেন। তা শুনে এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু অমুক তো এই বলেন।'

প্রত্যুত্তরে ইবনে সীরীন বললেন, 'আমি তোমাকে নবী ﷺ-এর হাদীস বয়ান করছি, আর তুমি বলছ, অমুক ও অমুক এই বলেছে?! আমি তোমার সাথে কোনদিন কথাই বলব না।' *(দারেমী ৪৪১নং)*

আবুস সায়েব বলেন, একদা আমরা অকী'র কাছে ছিলাম। তিনি তাঁর কাছের একটি লোকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ (মক্কার হারামের জন্য প্রেরিত কুরবানীর উঁটের দেহ চিরে) চিহ্ন দিয়েছেন। আর আবূ হানীফা বলেন, তা (নিষিদ্ধ) অঙ্গহানি করণের অন্তর্ভুক্ত!'

ঐ লোকটি রায়-ওয়ালা ছিল। সে বলল, কিন্তু ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, '(ঐ ধরনের) চিহ্ন দেওয়া অঙ্গহানি করার পর্যায়ভুক্ত।'

এ কথা শোনার পর দেখলাম, অকী' চরমভাবে রেগে উঠলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, 'আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন। আর তুমি বলছ, ইবরাহীম বলেছেন! তুমি এর উপযুক্ত যে, তোমাকে ততদিন পর্যন্ত জেলে বন্দী রাখা হবে; যতদিন না তুমি তোমার ঐ কথা প্রত্যাহার করে নিয়েছ।' *(তিরমিযী ৩/২৫০)*

একদা হযরত মুআবিয়া رضي الله عنه কা'বাগৃহের তওয়াফ করছিলেন। তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও অন্য দুটি রুক্‌ন (কোণ)কে স্পর্শ করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ইবনে আব্বাস رضي الله عنه। তাঁর এই আমল দেখে তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ হাজ্‌রে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য রুক্‌ন স্পর্শ করতেন না।' মুআবিয়া বললেন, 'আল্লাহর গৃহের কোন রুক্‌নই তো পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নয়।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'কিন্তু (মহান আল্লাহ বলেন,)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٦) (الأحزاب ٢١)

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)* এ কথা শুনে মুআবিয়া বললেন, 'ঠিকই বলেছ।' *(তিরমিযী, শাফেয়ী, আহমাদ)*

৫। 'আহলে সুন্নত সাহাবাদের কোনো কাজকে সুন্নত মানে। কিন্তু গয়ের মুকাল্লিদরা জুমার প্রথম আজানকে উছমানি বেদাত বলে।'

আহলে হাদীসরাও সাহাবাদের কোন কাজ সুন্নত বলে মানে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ).

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

তবে আহলে হাদীস সাহাবাদের সুন্নতকে নবী ﷺ-এর সুন্নতের স্থানে স্থানান্তরিত করে না এবং সাহাবার সুন্নতকে তাঁর সুন্নতের ওপর প্রাধান্য দেয় না। এই জন্যই তিন তালাকের ব্যাপারে উমারের সুন্নতকে আহলে হাদীসরা মান্য করে না। কারণ সেই স্থানে নবী ﷺ ও আবূ বাকর সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর সুন্নত মজুদ রয়েছে।

পক্ষান্তরে জুমআর প্রথম আযানকে অনেকে 'উসমানী বিদআত' বলে আখ্যায়ন করলেও আহলে হাদীসদের অধিকাংশ উলামা তাঁদের সাথে একমত নন। যেহেতু সে স্থানে নবী ﷺ-এর কোন সুন্নত ছিল না। আর তাই তাঁরা এটিকে 'উসমানী সুন্নত' মনে করেন। প্রয়োজনে তা মানা যাবে। তা বলে দ্বিতীয় আযান কেবল মসজিদের লোকের জন্য মেম্বরের কাছে নয়।

৬। 'আহলে সুন্নত নামাজের পরে হাত তুলে দোয়া করে। অথচ ওরা হাত তুলে দোয়া করাকে বেদাত বলে।'

অনেক গোঁড়া আহলে হাদীসও ঐরূপ দুআ করে। তবে যেহেতু তার সপক্ষে কোন সহীহ দলীল নেই, সেহেতু 'ওরা' বিদআত মনে করে।

৭। ‘আহলে সুন্নত ফেকাহ মানে। কিন্তু আহলে হাদীস ফেকাহ অস্বিকার করে।’

বাস্তব কথা এই যে, আহলে সুন্নত (হানাফী) কেবল হানাফী ফেকাহ মানে। আর আহলে হাদীস ‘ফিক্বহুস সুন্নাহ’ মানে। তারা ফিক্বহ, অসূলে ফিক্বহ সবই মানে। তবে নির্দিষ্ট কোন মযহাবভিত্তিক নয়, কিতাব ও সুন্নাহভিত্তিক। কিন্তু এই ভুল ধারণাই মুফতী সাহেবকে ধোঁকায় ফেলেছে। আর তার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘ফিক্বহ’ ছাড়া গতি নেই---এ কথার মালা গেঁথেছেন এবং বইয়ের শেষে ইজতিহাদী বিষয়ক ৫০টি প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন।

৮। ‘আহলে সুন্নত ক্বরের শাস্তি এবং শান্তিকে মানে। আহলে হাদীস তা স্বীকার করে না।’

এটিও মুফতীজীর সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার ফসল। সুধী পাঠকগণ আহলে হাদীসের আক্বীদার বই-পুস্তক পড়ে দেখতে পারেন, ‘সত্য সমাগত’-ওয়ালার এ কথা সত্য কি না?

৯। ‘নবী পাক জীবিত আছে এ কথা আহলে সুন্নত মানে। আহলে হাদীস তা স্বীকার করে না।’

নবী ﷺ জীবিত থাকলে তাঁকে মাটি-চাপা রেখেছেন কেন?

আহলে হাদীসরাও বলে, ‘তিনি জীবিত আছেন।’ কিন্তু কেমন সে জীবন? তাই নিয়ে তো দ্বন্দ্ব। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} (١٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৫৪)*

আহলে হাদীসরা এ কথা অবশ্যই মানে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব দিই।” *(আবূ দাঊদ)*

আহলে হাদীস এ হাদীসও মানে। যেটা মানে না, সেটা হল ইন্তিকালের পর তাঁর ইহলৌকিক জীবন।

১০। ‘আহলে সুন্নত তারাবির নামায ২০ রাকআত মানে। গয়ের মুকাল্লিদ ৮ রাকআত মানে।’

যেহেতু ‘গয়ের মুকাল্লিদ’ বুখারী-মুসলিমের এই হাদীসকে মান্য করে,

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً...

আবূ সালামাহ বিন আব্দুর রহমান আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামায কত রাকআত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না।’ *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮-নং)*

পরন্তু অধিকাংশ উলামা বলেন, নফল হিসাবে বেশী পড়লে কোন ক্ষতি নেই।

১১। ‘আহলে সুন্নত হুজুরের রওজা শরীফ জিয়ারত করাকে সওয়াব জানে। গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস হারাম মনে করে।’

এ কথাটিও একজন অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের বক্তব্য। নচেৎ আহলে হাদীস রওযার কদর জানে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ).

“আমার ঘর (কবর) ও মেম্বরের মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।” (বুখারী-মুসলিম)

অবশ্য ‘রওজা শরীফ’ বলে মুফতী সাহেবের উদ্দেশ্য ‘কবর শরীফ’। তবুও আহলে হাদীস তাঁর কবর যিয়ারত হারাম বলে না। বরং মসজিদে নববীর যিয়ারতে গেলে তাঁর কবর যিয়ারত মুস্তাহাব বলে। তাহলে এই শ্রেণীর অপবাদ ও বিভ্রান্তি প্রচার ক’রে সাধারণ মানুষের মনে আহলে হাদীসদের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি উদ্দেশ্য নয় কি?

১২। ‘আহলে সুন্নত হুজুরের নিজ কানে শোনার দাবি করে যখন হুজুরের রওজা শরীফের নিকট দরূদ সালাম পড়া হয়। গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস হারাম মনে করে।’

সুধী পাঠক! এখানে ‘হারাম মনে করে’ কথাটি কি নবী ﷺ-এর শোনা বা না শোনার ব্যাপারে প্রযোজ্য? এটাও কি তাঁর পক্ষে শরয়ী নির্দেশ?

আসলে এটি একটি আক্বীদাগত বিষয় যে, নবী ﷺ মধ্যজগৎ থেকে ইহজগতের সালাম শুনতে পান কি না?

আহলে হাদীসরা বলে, তিনি স্বকর্ণে দরূদ ও সালাম শুনতে পান না। ফিরিশ্তার মাধ্যমে তাঁর কাছে তা পৌঁছানো হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه

(فإن صلاتكم معروضة علي....)

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম একটি দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পাঠ করা দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" *(আবূ দাঊদ)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না (যেমন কবর-পূজারীরা উরস ইত্যাদির মেলা লাগিয়ে ক'রে থাকে)। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পেশ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।" *(আবূ দাঊদ)*

তিনি বলেননি, "তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমি শুনতে পাই।" তাছাড়া আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ).

"পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রমণরত বহু ফিরিশ্তা রয়েছেন, যাঁরা আমার উম্মতের নিকট হতে আমাকে সালাম পৌঁছে দেন।" *(মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

১৩। 'আহলে সুন্নত মহিষ কুরবানী জায়েয মনে করে। গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস হারাম মনে করে।'

যেহেতু মহিষ কি গরুর শ্রেণীভুক্ত? এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, মহিষ কুরবানী যথেষ্ট নয়।

১৪। 'আহলে সুন্নত ঘোড়ার কুরবানী হারাম জানে। গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস হালাল বলে।'

প্রিয় পাঠক! শুধু 'গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস'ই নয়। বরং শাফেয়ী, হাম্বলী এবং এক বর্ণনা অনুসারে মালেকীও ঘোড়ার গোশ্ত হালাল মনে করে। আর এরা তো মুফতী সাহেবের মতে 'আহলে সুন্নত'। আর হানাফীদের কাছে 'মুফতা বিহ' হল মকরূহে তানযীহী, হারাম নয়।

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ - وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حِل أَكْلِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْبَابِ لِاخْتِلَافِ السَّلَفِ.

(দ্রঃ আল-মাউসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ ৩৫/২১০-২১১, আল-ফিক্বহু আলা মাযাহিবিল আরবাআহ ২/৯)

১৫। 'আহলে সুন্নত নামাযের মধ্যে কুরান শরীফ দেখে পড়াকে নাজায়েয বলে। গয়ের মুকাল্লিদ জায়েয এবং ঠিক বলে।'

শুধু 'গয়ের মুকাল্লিদ'ই নয়, মুকাল্লিদ শাফেয়ীরাও জায়েয বলে। যেহেতু মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জায়েয বলেছেন।

(وكانت عائشة يؤمها ذكوان من المصحف).

যাকওয়ান মুসহাফ দেখে ইমামতি করতেন এবং তাঁর পশ্চাতে আয়েশা নামায পড়তেন। *(দ্রঃ বুখারী ২/১০৩, বাইহাক্বী ৩১৮৩, মঅত্ত্বা ১/৩৫৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৭২১৭নং)*

১৬। 'আহলে সুন্নত জুনুবি মেয়ে অর্থাৎ যার গোসল ফরজ হয়ে গেছে এমন মেয়ে কুরয়ান শরীফ পড়তে পারবে না বলে। গয়ের মুকাল্লিদ আহলে হাদীস জায়েয বলে।'

সঙ্গমজনিত কারণে গোসল ফরয হলে নারী-পুরুষ কারো জন্য কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা অথবা পড়া বৈধ নয়। ঋতুমতী মহিলা মাসিক ও প্রসবোত্তর খুন জারি থাকাকালে (প্রয়োজনে) কুরআন মুখস্থ পড়তে পারে। যেহেতু তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস (সহীহ) প্রমাণিত নেই। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ, সঊদী আরব ৪/৭৪)*

১৭। 'আহলে সুন্নত শাশুড়ির সঙ্গে স্ত্রীসুলভ ব্যবহারের জন্য স্ত্রী হারাম হওয়ার কথা বলে। অথচ আহলে হাদীস গয়ের মুকাল্লিদদের নিকট হারাম হয় না বলে।'

শুধু 'গয়ের মুকাল্লিদ'রাই নয়, মুক্বাল্লিদ মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরাও তাই মনে করে। তারা মনে করে, বৈধ সঙ্গম যা হারাম করে, অবৈধ সঙ্গম তা পারে না।

১৮। 'আহলে সুন্নত হুজুরের রওজা শরীফকে পবিত্র স্থান মনে করে। অথচ গয়ের মুকাল্লিদ বেদাত বলে উহাকে ভেঙ্গে দেওয়াকে ওয়াজিব বলে।'

আহলে হাদীস শুধু নবী ﷺ-এর কবরই নয়, মদীনার হারামকেও পবিত্র বলে মানে। কিন্তু মুফতী সাহেবের উদ্দেশ্য কী?

'উহাকে ভেঙ্গে দেওয়াকে ওয়াজিব বলে।' কাহাকে? কবরকে, না তার উপরের গম্বুজকে?

কবর তো মাটির সাথে মিশে আছে। তা ভাঙ্গার প্রশ্নই আসে না। কবর আছে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরের ভিতরে। সে ঘর ভাঙ্গারও প্রশ্ন আসে না। প্রশ্ন হল তার উপরের গম্বুজ নিয়ে। প্রশ্ন হল সেই ঘরকে মসজিদের মাঝে ভরে নেওয়াকে নিয়ে।

যাঁরা ভাঙ্গার কথা বলেছেন, তাঁরা মসজিদ ভেঙ্গে 'হুজরা'কে মসজিদ থেকে পৃথক করতে বলেছেন। সবুজ গম্বুজ ভেঙ্গে শির্কী ফিতনার কারণ দূর করতে বলেছেন। *(দ্রঃ তাহযীরুস সা-জিদ)*

১৯। 'আহলে সুন্নত জানাজার নামায আস্তে পড়ে। গয়ের মুকাল্লিদ উচ্চস্বরে পড়ে।'

নিঃশব্দেও পড়ে, সশব্দেও পড়ে। দুই রকমই প্রমাণিত বলেই।

২০। 'আহলে সুন্নত নামাজে রূকু পেলে রাকাত পাওয়া সাব্বস্ত করে। গয়ের মুকাল্লিদ রাকাত সাব্বস্ত করে না।'

যেহেতু তারা মনে করে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা ব্যতিক্রমধর্মী বলে বহু আহলে হাদীস উলামা আবূ বাকরার হাদীস দ্বারা রাকআত গণ্য হবে বলে মনে করেন।

২১। 'আহলে সুন্নত কওমাতে হাত ছেড়ে দেয়। অথচ সিন্ধের গয়ের মুকাল্লিদরা হাত বেঁধে রাখে।'

মুকাল্লিদ হাম্বলীরাও রাখে। দলীল আছে বলেই তো।

২২। 'আহলে সুন্নত মনসুখ হাদীসের উপর আমল করে না। অথচ গয়ের মুকাল্লিদ আমল করে এবং বড় জিহাদ মনে করে।'

এটি গা-জোরামি কথা। আহলে হাদীস কোন হাদীসকে অন্ধ পক্ষপাতিত্ববশে চোখ বুজে 'মনসূখ' বলে না। যেমন কোন যয়ীফ হাদীসকে 'নাসেখ' গণ্য করে না। "যে আয়াত ও হাদীস আমাদের মযহাব-বিরোধী, তা মনসূখ অথবা ব্যাখ্যেয়" বলে জিহাদ ঘোষণা তো আপনারা ক'রে রেখেছেন।

২৩। 'আহলে সুন্নত মগরিবের আজানের পরে নফল পড়ে না। গয়ের মুকাল্লিদ এমনি নফলের শত্রু কিন্তু এখানে পড়ে।'

শুধু আহলে হাদীসই নয়, শাফেয়ী ও হাম্বলীরাও পড়ে। তবে তারা তো চোখের বালি নয়। কেবল আহলে হাদীস নফলের শত্রু! যেহেতু তারা যয়ীফ হাদীস-ভিত্তিক এমন কিছু নফল নামাযকে বিদআত বলে, যা আপনাদের নিকট সুন্নত তাই। উদাহরণ স্বরূপ, শবেবরাতের নামায, মাগরেবের পর ৬ রাকআত আওয়াবীনের নামায, মা-বাপের জন্য নামায, ঈদের রাতের নামায, কাযা উমরী নামায, এহতিয়াতী যোহর ইত্যাদি।

পরন্তু গ্রামের কোন কোন লোককে চুরি করতে দেখে 'চোর-গাঁ' বলার মতো গোটা আহলে হাদীসের আম-খাস সকলকে 'নফলের শত্রু' বললে এমন আল্‌গা জিভের হিসাব কি হবে না বলছেন?

২৪। 'আহলে সুন্নতদের এখানে পুরুষ মহিলাদের নামাজের ক্ষেত্রে জায়গা পৃথক। গয়ের মুকাল্লিদদের নিকট কোনো পার্থক্য নেই।'

বুঝলাম না, মুফতী সাহেব কী বুঝাতে চেয়েছেন। আমরা তো জানি, আহলে হাদীসের মহিলা-পুরুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ে না। মহিলাদের জায়গা পুরুষদের পিছনে। তাহলে পার্থক্য নেই কেন?

২৫। 'আহলে সুন্নত নাবালোক বাচ্চার ইমামতি জায়েজ বলে না। গয়ের মুকাল্লিদ জায়েজ বলে।'

শুধু আহলে হাদীসই নয়, মুক্বাল্লিদ শাফেয়ীরাও জায়েয বলে। যেমন মালেকী ও হাম্বলীরাও নফল নামাযে জ্ঞানসম্পন্ন নাবালক বাচ্চার ইমামতি জায়েয বলে। যেহেতু সাহাবী আম্‌র বিন সালামাহ ৬-৭ বছর বয়সে লোকেদের ইমামতি করেছেন। আর তিনি ছিলেন সকলের মধ্যে বেশী কুরআনের হাফেয। *(বুখারী ৪৩০২, মুসলিম, আবু দাউদ ৫৮৫নং)*

২৬। 'আহলে সুন্নত সুরা ফাতেহাকে কুরানের মধ্যে গণ্য করে। গয়ের মুকাল্লিদ গণ্য করে না।'

সুধী পাঠক! তাহলে কি মুফতী সাহেব বলতে চান, 'গয়ের মুকাল্লিদ' সূরা ফাতিহাকে কুরআন মাজীদের সূরা বা আয়াত বলে অস্বীকার করে? আপনি তা বুঝতে পারেন। আর তা বুঝলে তবেই তো আহলে হাদীসের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্বেষ বাড়বে। এমন উস্কানি না পেলে তো তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হবেন না। ইউপিতে থাকাকালে দাঙ্গার সময় একটা কথা শুনতাম, 'আরে ইয়ার! এহ মুল্লা লোগই লড়াতে হ্যাঁয়।' আসলে কথাটি অনেকটা সত্য। মুরগীকে অপর মুরগীর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াতে হয়, সে বিদ্যে অনেক আলেমের নখদর্পণে। আপনি মুফতী সাহেবের আলোচ্য 'সত্য সমাগত' বইয়ের অনেক জায়গায় এমন উস্কানিমূলক কথা, 'চ্যালেঞ্জ' ও ঘোষিত পুরস্কার অবশ্যই লক্ষ্য করবেন।

আহলে হাদীসের কাছে সূরা ফাতিহা শুধু কুরআন বলেই গণ্য নয়, বরং তা 'কুরআনে আযীম'। সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা, অবতরণিকা, উপক্রমণিকা ইত্যাদি। এ জন্যই তো কুরআন ত্রিশ পারা, কিন্তু তাকে কোন পারার ভিতরে না রেখে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আসলে আহলে হাদীস ও কিছু মুক্বাল্লিদ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ে বলে মুফতী সাহেবের এমন অপবাদমূলক অভিযোগ। অল-হিসাবু য়্যাউমাল হিসাব। অল্লাহুল মুস্তাআন।

২৭। 'আহলে সুন্নত তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদকে পৃথক জানে গয়ের মকাল্লিদরা এক মনে করে।'

এ ব্যাপারে মা আয়েশার হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্যই আহলে হাদীসরা আপন খেয়াল-খুশীর অনুসারী নয়।

২৮। ‘আহলে সুন্নত বেতের তিন রাকাত পড়ে। গয়ের মুকাল্লিদ বেতের এক রাকাত পড়ে।’

আহলে হাদীসরা বিত্র নামায ১ থেকে ৯ রাকআত পড়ে থাকে।

বিত্র এক রাকআত পড়া নাজায়েয নয়। খোদ মহানবী ﷺ এক রাকআত বিত্র পড়তেন। তিনি বলেন, “রাতের নামায দু রাকআত দু রাকআত। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে, তখন সে যেন এক রাকআত বিত্র পড়ে নেয়।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, “বিত্র হল শেষ রাতে এক রাকআত।” *(মুসলিম, মিশকাত ১২৫৫নং)*

তিনি বলেন, “বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।” *(আবু দাউদ ১৪২২, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৫নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলা হল যে, মুআবিয়া ﷺ এশার পরে এক রাকআত বিত্র পড়লেন (সেটা কি ঠিক)? উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি তো ফকীহ। তাঁকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী।’ *(বুখারী, মিশকাত ১২৭৭নং)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য বহু সলফ ১ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ দ্রঃ)*

মুফতী সাহেব (৪৪ পৃষ্ঠায়) আহলে সুন্নত ও আহলে হাদীসের উক্ত সকল পার্থক্য বর্ণনা ক’রে লিখেছেন, ‘দুই দলের মধ্যে পার্থক্য আছে।’

অবশ্যই আছে। খোদ আহলে সুন্নতে-আহলে সুন্নতে হাজারো পার্থক্য আছে। ‘সুন্নত’ ও ‘হাদীস’ এক নয় বলে ‘আহলে সুন্নত’ ও ‘আহলে হাদীস’ এক নয়, কিন্তু ‘সুন্নত’ ও ‘সুন্নত’ তো এক বটে। তবুও চার আহলে সুন্নতের মধ্যে এত মতপার্থক্য কেন? নাকি সে পার্থক্য ‘দেখতে লারি চলন বাঁকা’র পর্যায়ে পড়ে না তাই? যত দোষ এই নন্দঘোষ আহলে হাদীসের? বা-রে ইনসাফ!

আহলে হাদীস ও হানাফীদের মাঝে আসল পার্থক্য

মুফতী সাহেবের মতে হানাফীরা হাদীসের খেলাপ করেন না। তাঁরা কুরআন-হাদীস বুঝতে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)কে মাধ্যম বানান মাত্র।

অতঃপর যা বুঝেন, তারই অনুকরণ করেন। অন্য কোন ইমামের বুঝ গ্রহণ করেন না।

আহলে হাদীস সকল ইমামকেই কুরআন-হাদীস বুঝার মাধ্যম মনে করে। অতঃপর যাঁর কথা কুরআন-হাদীসের অধিক নিকটবর্তী পায়, তাঁর অনুসরণ করে।

হানাফীরা নির্দিষ্ট এক ইমামের ‘তাক্বলীদ’ (অন্ধানুকরণ) করেন।

আহলে হাদীসরা সকল মুজতাহিদ ইমামগণের ‘ইত্তিবা’ (দলীল দেখে অনুসরণ) করে।

হানাফীরা মযহাবের খেলাপ কোন হাদীস এলে সেটাকে ‘সহীহ’ বলে মানতে চান না। অথবা তার অন্য ব্যাখ্যা করেন। অথবা সেটাকে ‘মনসূখ’ মনে করেন। যেহেতু তাঁদের মযহাবী ফিক্বহ অপরিবর্তনীয়। যদিও ‘গায়র মুফতা বিহ’ মাসায়েল রয়েছে তাঁদের ফিক্বাহতে।

আহলে হাদীসরা কোন মুহাদ্দিসের মাধ্যমে সহীহ হাদীস পেলে এবং মনসূখ প্রমাণিত না হলে সেটাকে নিজেদের মযহাব বলে মেনে নেয়। কৃত আমলের দলীল হাদীস ‘যয়ীফ’ জানতে পারলে আমল বর্জন করে।

মুক্বাল্লিদরা নিজেদের ফিক্বহের মসলা প্রমাণ করার জন্য যয়ীফ-জাল হাদীসকে দলীল মনে করেন। প্রয়োজনে সহীহ হাদীসকে মনসূখ বলেন, অপব্যাখ্যা করেন। অথচ ইমামগণ বলে গেছেন যে, ‘হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।’

আহলে হাদীসরা সহীহ হাদীস থেকে নিজেদের মসলা চয়ন করে।

অন্য কথায়, মযহাবীদের আগে ‘তা’সীস’ তারপর ‘তাদলীল’। আর আহলে হাদীসদের আগে ‘তাদলীল’ তারপর ‘তা’সীস’।

অর্থাৎ, মযহাবীরা যেহেতু নির্দিষ্ট ফিক্বহী সীমার বাইরে যেতে পারেন না। তাই সেই বনেদী ফিক্বহকে প্রমাণ করার জন্য দলীল খোঁজেন। পক্ষান্তরে আহলে হাদীস দলীল দেখে কোন মসলার বুনিয়াদ রাখেন।

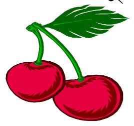

তারকা থেকে ঈমানজয়ী কারা?

হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ مِنْ

أَبْنَاءِ فَارِسَ - حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ).

অর্থাৎ, দ্বীন যদি ‘সুরাইয়া’ (সপ্তকন্যা) নক্ষত্রগুচ্ছে থাকত, তবুও পারস্যের এক লোক অথবা পারস্যের সন্তানগণ সেখানে গিয়ে পেয়ে নিত। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قَالَ رَجُلٌ مَنْ هَـؤُلاَءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - قَالَ - وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ - قَالَ - فَوَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ « لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلاَءِ ».

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর উপর সূরা জুমআহ অবতীর্ণ হল। যখন তিনি এই আয়াত পড়লেন---যার অর্থ, “আর তাদের অন্যান্যদের জন্যও (রসূল প্রেরিত হয়েছে), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” উপবিষ্ট লোকেদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা?’ নবী ﷺ তার কথার উত্তর দিলেন না। শেষ পর্যন্ত সে এক, দুই অথবা তিনবার জিজ্ঞাসা করল। (আবূ হুরাইরা ﵁) বলেন, আর আমাদের মাঝে সালমান ফারেসী ছিলেন। নবী ﷺ নিজ হাত সালমানের উপর রেখে বললেন, “ঈমান যদি ‘সুরাইয়া’ (সপ্তকন্যা) নক্ষত্রগুচ্ছে থাকত, তবুও এদের কিছু লোক তা পেয়ে নিত। *(আহমাদ, মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

{وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (٣٨)

سورة محمد

অর্থাৎ, যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। *(মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)*□

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা বিমুখ হই, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে আমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা আমাদের মত হবে না। তারা কারা?’ তিনি সালমান ফারেসী ﵁-এর কাঁধে হাত মেরে বললেন, “এ এবং এর জাতি। দ্বীন যদি ‘সুরাইয়া’ (সপ্তকন্যা) নক্ষত্রগুচ্ছে থাকত, তবুও পারস্যের কিছু লোক তা পেয়ে নিত। *(আহমাদ,*

মুসলিম)

সুধী পাঠক! উক্ত হাদীসগুলি আবার একবার পড়ুন এবং বলুন, তাতে কি কোন নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি, বুযুর্গ বা ইমামের কথা বলা হয়েছে?

তাহলে মুফতী সাহেব ও তাঁর পূর্ববর্তীরা কীভাবে নির্দিষ্ট ক’রে নিয়ে বলতে পারেন যে, ‘হুজুর ইমাম আবূ হানীফার সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছেন’?

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর বিরুদ্ধে উলামাদের সমস্ত কুমন্তব্য ও সমালোচনা দৃষ্টিচ্যুত ক’রে মেনে নিলাম, তিনি ইমামে আ’যম।

তিনি তৃতীয় ‘খায়রুল কুরূন’ (শ্রেষ্ঠ শতাব্দি)র ইমাম ছিলেন।

তিনি একজন বড় মুজতাহিদ ছিলেন।

তার মানে তো এই নয় যে, উক্ত হাদীসগুলিতে তিনিই উদ্দিষ্ট। সুতরাং কেবল তাঁরই তাক্বলীদ করতে হবে।□

ক্বান্নূজী বা ক্বিন্নৌজী বলেন, ‘(উক্ত) হাদীসে সত্য রসূল ﷺ কর্তৃক আহলুল হাদীস ও হাদীসের উলামার ঈমানের খবর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তাঁরাই হাদীসের খোঁজে ও আষার সঞ্চয়নের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দেশ ও দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। এমনকি তাঁদের কিছু লোক একটিমাত্র হাদীসের খোঁজে একমাস অথবা তারও বেশি দূরত্বের পথ অতিক্রম করেছেন। যেন তাঁরা তাঁদের এই প্রয়াসে ‘সারা’ থেকে ‘সুরাইয়্যা’ (পৃথিবী থেকে তারকা) পর্যন্ত যাত্রা করেছেন। আর এই বিবরণ এই দল ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ কথা সেই হঠধর্মী অবিমৃষ্যকারী ছাড়া কেউ অস্বীকার করবে না, যে মানুষের নানা পরিস্থিতি ও বিশ্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই প্রতিপাদনকে (আবূ নুআইমের) এক বর্ণনায় উল্লিখিত নবী ﷺ-এর এই উক্তিও সমর্থন করে,

(يَتَّبِعُونَ سُنَّتِى وَيُكْثِرُونَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ).

অর্থাৎ, তারা আমার সুন্নাহর অনুসরণ করবে এবং আমার উপর অধিকাধিক দরূদ পাঠ করবে।

আর এই অনুসরণ ও এই দরূদ পাঠের আধিক্য মুহাদ্দিসীনদের দল ছাড়া অন্য কারো মাঝে নেই। পরন্তু যে ব্যক্তি আলোচ্য হাদীসকে উম্মতের কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ফুকাহাদের মধ্যে কোন ফকীহ বিশেষকে নির্দিষ্ট করবে, তার ধারণা সুদূর পরাহত।

হাদীসের ব্যক্তিত্ব ও তার স্তম্ভসমূহ পারস্য দেশেই ছিল। তাঁদের সূর্য উদিত হয় তৃতীয় শতাব্দিতে এবং বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমে নিজ আলো বিকীর্ণ করে। দ্বীনের ব্যাপারে তাঁরা আরবকে ছাড়িয়ে যান। এর দলীল সুন্নাহ

ইত্যাদিতে ছয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঃ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। এ ছাড়া দারেমী, বাইহাক্বী প্রমুখ।

'ফুর্স' অর্থাৎ, আজম (অনারব)। এরা হল ফারেস বিন জাবের বিন য়্যাফেষ বিন নূহ ﷺ-এর সন্তান। *(আওনুল বারী ৪/৭৩৮, ফাওয়াইদ ফিল মাআনী মিন কুতুবিল আলবানী ১/৬)*□

মুফতী সাহেব (৪৫ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'পবিত্র হাদীস পাকে যথেষ্ট ফারাক আছে। তার কারণ হল এক সময় একটা হুকুম দিলেন আবার কিছুদিন পরে কারণ বশতঃ অন্যের হুকুম দিলেন। হাদীস দুটোই! একটার উপর চলা যাবে অপরটিকে ছেড়ে দিতে হবে। এইরূপ হাদীস গুলোর মধ্যে প্রথমটিকে মনসুখ দ্বিতীয় টিকে নাসেখ্ বলা হয়। আমরা হুজুরের ১৪০০ বৎসর পরে এসে কি করে ফায়সালা করব যে এটা নাসেখ হাদীস আর এটা মনসুখ হাদীস।'

ইমাম আবূ হানীফা সমস্ত হাদীস জানতেন। তিনিই সকল নাসেখ-মনসূখ জানতেন। যেহেতু তিনি তাবেঈ ছিলেন। ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। সাহাবাদের মধ্যে গিয়ে নামায পড়তেন।

মনে হচ্ছে তিনি অনেক সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন। অথচ তিনি নবী ﷺ-এর সমস্ত হাদীস জানতেন না। বরং চার ইমামের মধ্যে তাঁরই হাদীস সংখ্যা কম। তিনি কেবল আনাস ﷺ-কে দেখেছেন কুফায়। তাঁর সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী বলেন,

أبو حنيفة الامام ، فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، مولى بني تيم اللّه بن ثعلبة يقال: إنه من أبناء الفرس. ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. ولم يثبت له حرف عن أحد منهم.

অর্থাৎ, আবূ হানীফা ইমাম, মিল্লতের ফক্বীহ, ইরাকের আলেম, আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবেত বিন যূতা তাইমী, কূফী, (কূফায় জন্ম) বানী তাইমুল্লাহ বিন সা'লাবার স্বাধীনকৃত। বলা হয়, তিনি পারস্যের সন্তান। সন ৮০ হিজরীতে বয়োকনিষ্ঠ সাহাবাদের জীবনে তাঁর জন্ম। তিনি আনাস বিন মালেককে দেখেছেন, যখন তিনি কূফায় আগমন করেন। তবে কোন সাহাবা হতে তাঁর (আবূ হানীফার) একটি অক্ষর (বর্ণনা)ও প্রমাণিত নয়। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৬/৩৯০-৩৯১)*

তাঁর আনাস ﷺ-কে দেখার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। সে যাই হোক, তিনি তাবেঈ হলেও, তার মানে এ নয় যে, কেবল তাঁরই তাক্বলীদ করতে হবে।

তবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, তিনি চল্লিশ বছর এশার ওযূতে ফজরের নামায পড়েছেন। ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। স্বপ্নে মহান আল্লাহকে ১০০ বার দর্শন করেছেন। বাম পা-কে ডান পায়ের পাতার উপর রেখে ক্বা'বা চত্বরে (এক পায়ে) দাঁড়িয়ে নামাযে কুরআন খতম করেছেন। আল্লাহ সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর মযহাবের সকল অনুসারীকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। *(আদ্-দুর্রুল মুখতার ১/৫৫)* তাহলে অবশ্যই সে তাঁর মযহাবের তাক্বলীদ করবে। যেহেতু তার ফলে হাজার পাপী হয়েও আল্লাহর ক্ষমা তো পাওয়া যাবে।

মুফতী সাহেব (৪৭ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, 'যে মুজতাহিদ নয়, তাকে তাক্বলীদ অবশ্যই করতে হবে।'

আমরা বলি, কোন নির্দিষ্ট আলেমের তাক্বলীদ না ক'রে উলামাদের ইত্তিবা' করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ সেটাই জ্ঞানীদের চিহ্ন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(যুমার ঃ ১৭-১৮)*

হাদীসের কিতাবের লেখকগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন না

মুফতী সাহেব (৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায়) দাবী করেছেন যে, কুতুবে সিত্তাহর লেখক মুহাদ্দিসীনগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন। যেমন মুফতী লিয়াকত আলি সাহেবও তাঁর অভিমতে লিখেছেন, 'যাঁরা প্রকৃত আহল হাদীস তাঁরা সবাই মজহাব মান্য করে চলেন। চারি মজহাবের কোনো না কোনো মজহাবকে তারা গ্রহণ করেছেন।'

এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, 'বুখারী ও আবূ দাঊদ ফিক্বহের মুজতাহিদ দুই ইমাম ছিলেন। আর মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, আবূ য়্যা'লা, বাযযার প্রমুখ আহলে হাদীসদের মযহাবে ছিলেন। তাঁরা নির্দিষ্ট কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। অবশ্য তাঁরা পরিপূর্ণরূপে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যেও গণ্য ছিলেন না। বরং তাঁরা হাদীসের ইমামগণ, যেমন শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, আবূ উবাইদ প্রমুখ ইমামগণের উক্তির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো কোন কোন ইমামের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞতা আছে। যেমন আবূ দাউদ প্রমুখের বিশেষজ্ঞতা আছে আহমাদ বিন হাম্বালের ব্যাপারে। তাঁরা আবূ হানীফা ও সওরীর ইরাকী মযহাবের তুলনায় মালেক প্রমুখের হিজাযী মযহাবের দিকে বেশি আকৃষ্ট ছিলেন।

পক্ষান্তরে আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী উল্লিখিত সকলের চাইতে পুরাতন। তিনি য়্যাহয়্যা বিন সাঈদ ক্বাত্ত্বান, য়্যাযীদ বিন হারূন ওয়াসেত্বী, আব্দুল্লাহ বিন দাউদ, অকী' বিন জার্রাহ, আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস, মুআয বিন মুআয, হাফ্স বিন গিয়াষ ও আব্দুর রহমান বিন মাহদীর স্তরের (ইমাম)। আর ওঁদের মত সকলেই ইমাম আহমাদের শায়খ (ওস্তাদ)গণের স্তরভুক্ত (ইমাম)।

ওঁরা সকলেই সুন্নাহ ও হাদীসের তা'যীম করতেন। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবূ হানীফা ও সওরী প্রমুখের ইরাকী মযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যেমন অকী' ও য়্যাহয়্যা বিন সাঈদ। আবার ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ মালেক প্রমুখের মাদানী মযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যেমন আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

পক্ষান্তরে বাইহাক্বী শাফেয়ীর মযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর অধিকাংশ উক্তিকে জয়যুক্ত করতেন।

দারাকুত্বনীও শাফেয়ী এবং সুন্নাহ ও হাদীসের ইমামগণের মযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তবে তিনি শাফেয়ীর তাক্বলীদে বাইহাক্বীর মতো ছিলেন না। যদিও বহু মাসায়েলে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল। কিন্তু দারাকুত্বনীর ইজতিহাদ তাঁর চাইতে বেশি বলিষ্ঠ। যেহেতু তিনি ছিলেন বাইহাক্বী অপেক্ষা জ্ঞানী ও সমঝদার। *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪০-৪১, আইম্মাতুল হাদীস নিছক মুক্বাল্লিদ ছিলেন না, সে কথা বিস্তারিত জানতে তুহফাতুল আহওয়াযীর ভূমিকা ১/২৭৭-২৮১ পড়ুন)*

সুতরাং এত এত হাদীস জানা সত্ত্বেও কোন ইমাম শরীয়তের সকল ফায়সালা যে দিতে পারবেন, তা জরুরী নয়। যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা কুরআন-হাদীস থেকে পাবেন না, তখন তিনি অবশ্যই কোন অন্য ইমামের

নীতি অবলম্বন ক'রে তাঁর ইত্তিবা' করবেন। নিছকভাবে তাঁর অন্ধানুকরণ করবেন না এবং কোন নির্দিষ্ট ইমামেরও তাক্বলীদ করবেন না, যে তাক্বলীদের নিন্দা খোদ ইমামগণই ক'রে গেছেন।

মুফতী সাহেব (৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'তানারা কারোর তাকলীদ করতেন না এবং গয়ের মকাল্লিদও ছিলেন না তানারা মুজতাহিদ ছিলেন।'

নিশ্চয়ই তাঁরা দ্বীনের রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ؓ-দের ইত্তিবা' করতেন। অবশ্যই তাঁরা কোন নির্দিষ্ট সাহাবী অথবা আলেমের তাক্বলীদ করতেন না। যেমন অপরকেও কারো তাক্বলীদ করতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মুফতী সাহেব গায়র মুক্বাল্লিদের চমৎকার সংজ্ঞা বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 'গয়ের মুকাল্লিদ তো ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজে এজতেহাদ করতে পারে না এবং মুজতাহিদের তাকলীদও করে না। তার কাজ হল ফেকাহ বিদদের গালি দেওয়া। আর তাঁদের তাকলীদ কারিদের মুশরিক বলা।'

সুধী পাঠক! মুফতী সাহেবের এ সংজ্ঞা নিছক বর্তমান দর্শন বৈ কিছু নয়। নচেৎ আলেম-অনালেম গায়র মুক্বাল্লিদ নিজে ইজতিহাদ করতে না পারলে অপরের তাক্বলীদ করে না। তার দরকারও নেই। যেহেতু তাক্বলীদ নিষিদ্ধ। তারা মুজতাহিদ আলেমদের ইত্তিবা' ও অনুসরণ করে। তাও নির্দিষ্ট কোন আলেমের নয়। যে আলেমের কথা তার প্রবৃত্তি ও মনের মতো, সেই আলেমেরও নয়। বরং যে বিষয়ে যে আলেমের মত ও পথ দলীল-পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও অধিক যুক্তিযুক্ত, সেই আলেমের অনুসরণ করে।

তাদের কাজ অপরকে আলোচ্য নিষিদ্ধ 'তাক্বলীদ' করতে নিষেধ করা। যেহেতু এটা তাদের দ্বীনী কর্তব্য। আয়েম্মায়ে কিরামগণ নিষেধ ক'রে গেছেন। যেহেতু তা 'আল-আমরু বিল মা'রূফ ও অন্-নাহয়ু আনিল মুনকার'-এর পর্যায়ভুক্ত।

ফিক্বহবিদ ও ফুক্বাহায়ে কিরামকে গালি দেওয়া তাদের কাজ নয়। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে 'মুশরিক' বা 'কাফের' বলা তাদের অধিকারভুক্ত নয়। যে তাক্বলীদ শির্ক, যে তাক্বলীদ পাদরী-পুরোহিতদেরকে 'রব্ব' মানার অন্তর্ভুক্ত, সেই তাক্বলীদ করাকে তারা 'শির্ক' বলে। বাকী কে কোন্ শ্রেণীর তাক্বলীদ করছে এবং সে মুশরিক কি না---সে হিসাব মহান আল্লাহ নেবেন। তিনিই যাকে তাওফীক ও সঠিক জ্ঞানদান করবেন, সেই পরিত্রাণ পাবে। সে ঐ নিষিদ্ধ তাক্বলীদ করবে না, যা আয়েম্মায়ে কিরাম করেননি এবং করতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মুফতী সাহেব (৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'আপনারা অনেক সময় অসন্তুষ্ট

হয়ে বলেন যে আমাদেরকে গয়ের মুকাল্লিদ না বলে আহলে হাদীস বলুন।....যে শব্দটি নিজেদের জন্য ঘৃণা বা খারাব ধারণা করেন, সেই শব্দটি সাহাবাদের এবং চার ইমামগণের জন্য ইজ্জত এবং সম্মানের পাত্র মনে করেন। না এটা কখনো হতে পারে না।'

সত্যই এটা কখনই হতে পারে না। 'গায়র মুক্বাল্লিদ' শব্দতে আমরা অসন্তুষ্ট হব কেন? এ শব্দ নিজেদের জন্য ঘৃণা বা খারাপ মনে করব কেন? সত্যই এ আখ্যায়ন আমাদের গর্বের বিষয়। যেহেতু তা সাহাবা ও ইমামগণের বৈশিষ্ট্য। আমরা এ আখ্যায়নে গর্বিত এই বলে যে, আমরা তাঁদের নির্দেশ পালন করতে পারছি। 'তাক্বলীদ করো না'---এ আদেশ মেনে নিয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে পারছি।

'নেড়ি তোর নেড়ি নামে কিবা পরিতাপ,
গোলাপে যে নামে ডাকে তবু সে গোলাপ।'

দলীল পরস্পর-বিরোধী হলে

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্ণিত হাদীসের পরস্পর-বিরোধিতা নানা মযহাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

সুতরাং ইখতিলাফী মাসায়েলের তাহক্বীক্বে যাওয়ার আগে আহলে হাদীসের তাহক্বীক্বের পদ্ধতি জেনে রাখা দরকার।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আহলে হাদীসের পূর্ব ফায়সালাকৃত কোন মাসআলা থাকে না। সুতরাং সেটাকে মাথায় রেখে আয়াত ও হাদীসের তাহক্বীক্ব করে না।

শরীয়তের দলীল পরস্পর-বিরোধী বর্ণিত হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, উভয় শ্রেণীর হাদীস সহীহ কি না?

যদি এক শ্রেণীর হাদীস যয়ীফ হয়, তাহলে সহীহ হাদীস হয় আহলে হাদীসের মযহাব। সে ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস দিয়ে সহীহ হাদীসের নির্দেশকে 'রহিত' (মনসূখ) প্রমাণ করা যাবে না।

উভয় শ্রেণীর হাদীস নিয়ে যদি উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব ও মতভেদ হয় এবং তার 'সহীহ' বা 'যয়ীফ' হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী মত থাকে, তাহলে সত্যানুসন্ধানী রিজাল-শাস্ত্রবিদ মুহাক্কিক মুহাদ্দিসদের অভিমত অনুসারে সঠিক ফায়সালা নিরূপণ করতে হবে।

উভয় শ্রেণীর হাদীস সহীহ হলেও চোখ বন্ধ ক'রে একটিকে 'নাসেখ' এবং অপরটিকে 'মনসূখ' বলা যাবে না। অবশ্য তাতে স্পষ্টভাবে যদি 'মনসূখ' হওয়ার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

এ ক্ষেত্রে কোন হাদীসকে বাদ না দিয়ে উভয় শ্রেণীর হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন ক'রে আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

হয়তো বা এক শ্রেণীর হাদীস আম এবং অন্য শ্রেণীর খাস। আর তখন আমকে আমভাবে এবং খাসকে খাসভাবে আমল করতে হবে।

প্রথম শ্রেণীর হাদীস 'হ্যাঁ'-বাচক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীস 'না'-বাচক হলে 'হ্যাঁ'-বাচককে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, তা অতিরিক্ত ইল্ম।

হয়তো বা উভয় শ্রেণীর আমল নবী ﷺ করেছেন। তাই উভয় প্রকার আমলই---কখনো এটা, কখনো ওটা করা যাবে।

এবারে চলুন, মাষ্টার নূরুল্লাহ সাহেব সহ অন্যান্য শিক্ষিত মানুষদের জন্য স্পষ্ট করি যে, আহলে হাদীসরা কীভাবে হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে।

আমীন সশব্দে না নিঃশব্দে?

মুফতী সাহেব (৫০ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'এ ব্যাপারে হাদীস পাকে দুই রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। কোন রেওয়ায়েতে আমীন জোরে পড়ার কথা বুঝে আশে আবার কোনো রেওয়ায়েতে আস্তে পড়ার হুকুম হয়েছে।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'হজরত অয়েল বেন হাজার থেকে বর্ণিত আছে উনি বলেন......আমীন বলেছেন এবং আওয়াজ টাকে টেনে বলেছেন এবং আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর উচ্চস্বরে বলেছেন।'

তিরমিযীর আর এক বর্ণনা নকল ক'রে তিনি বলেছেন, '.....আমীন বলেছেন তবে নিম্নস্বরে আস্তে বলেছেন।'

অতঃপর তিনি সমীক্ষা পেশ ক'রে বলেছেন, 'আমরা একটু চিন্তা করি প্রথম রেওয়ায়েতে আছে--- مد بها صوته অর্থাৎ, আওয়াজটাকে টেনে পড়েছেন এখানে জোরে বা আস্তে দুটই হতে পারে, তবে জোরে পড়ার সম্ভব আছে নিশ্চিত নয়।'

সুধী পাঠক! আপনার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগবে, জোরে পড়া নিশ্চিত নয় কেন? তার মানে কি আস্তে (নিঃশব্দে) পড়াই নিশ্চিত বুঝা যায় উক্ত হাদীস থেকে? তাহলে সাহাবী সেই টেনে বলা 'আমীন' শুনলেন কীভাবে?

বলাই বাহুল্য যে, সুনিশ্চিতভাবে সে 'আমীন' ছিল সশব্দে। মুফতী সাহেব নিজেই বলেছেন, 'আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর উচ্চস্বরে বলেছেন।' যেমন নাসাঈতেও এই শব্দ আছে।

আবূ দাউদ ও ত্বাবারানীতে আছে, . فجهر بآمين অর্থাৎ, সশব্দে বা জোরে 'আমীন' বললেন। তাতেও কী মুফতী সাহেব নিশ্চিত হতে

পারছেন না যে, 'আমীন' জোরেই ছিল? □

তারপর মুফতী সাহেব লিখছেন, 'দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে--- خفض بها صوته অর্থাৎ নিম্ন একদম আস্তে পড়েছেন।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন হবে, 'একদম' অনুবাদের আরবী শব্দ কী? অথচ শব্দের অর্থ হয় নিম্ন স্বরে বলা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে, এই বর্ণনা থেকে কি বুঝা যায় যে, আমীন 'আস্তে পড়ার হুকুম হয়েছে'?

তারপর তিনি লিখেছেন, 'এই রেওয়ায়েতে আস্তে পড়া নিশ্চিত বুঝা যাচ্ছে। আর জোরে পড়ার সম্ভব বা সন্দেহ মোটেই বুঝা যাচ্ছে না।'

পাঠকের মনে প্রশ্ন হবে, যদি তাই হয়, তাহলে সাহাবী শুনলেন কীভাবে? সুতরাং অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, তিনি সশব্দে 'আমীন' বলেছেন, কিন্তু আস্তে বলেছেন, খুব চিল্লিয়ে বলেননি। যেমন এ কথা স্বীকার করেছেন ইবনে হুমাম হানাফী। *(শারহু ফাতহিল ক্বাদীর ১/২৯৫)*

তারপর মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'ইনি ছাড়া অন্যান্য সাহাবাগণদের (?) থেকেও আমীন পড়ার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু জোরে না আস্তে এ ব্যাপারে স্পষ্ট শব্দ নেই।'

প্রিয় পাঠক! চলুন আমরা মুফতী সাহেবের এই দাবীর সত্যতা যাচাই করি ঃ-

১। আবূ হুরাইরা ؓ

عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين ، وكان رسول الله ﷺ إذا قال : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ قال : " آمين " . حتى سمعها أهل الصف الأول ؛ فيرتج بها المسجد . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه واللفظ له

তিনি বলেন, লোকেরা 'আমীন' বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ যখন 'গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্-য্বা-ল্লীন' বলতেন, তখন 'আমীন' বলতেন। এমনকি প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনতে পেত এবং তার ফলে মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠত। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. متفق عليه

অর্থাৎ, ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল।

কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়। *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাঊদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

عن أبي هريرة كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة { أم القرآن } ؛ رفع صوته فقال : "آمين". أخرجه الدارقطني ، والحاكم (٢٢٣/١) ، والبيهقي

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করতেন, তখন জোরে 'আমীন' বলতেন। *(দারাকুত্বনী, হাকেম ১/২২৩, বাইহাক্বী)*

২। আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ

عن سالم عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ كان إذا قال : { وَلَا الضَّالِّينَ } ؛ قال : " آمين " . ورفع بها صوته .

অর্থাৎ, ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন 'অলায্য্বা-ল্লীন' বলতেন, তখন 'আমীন' বলতেন এবং নিজের আওয়াজকে উঁচু করতেন। *(দারাকুত্বনী)*

৩। উম্মুল হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

عن ابن أم الحُصَين عن أمه : أنها صلّت خلف رسول الله ﷺ ، فلما قال : {وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ قال : " آمين " . فسمعته وهي في صف النساء . رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في الكبير

অর্থাৎ, উম্মুল হুস্বাইন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছেন। তিনি 'অলায্য্বা-ল্লীন' বলে 'আমীন' বললে উম্মুল হুস্বাইন মহিলাদের কাতার থেকে শুনতে পেলেন। *(মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ, ত্বাবারানীর কাবীর)*

৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

عن عائشة عن النبي ﷺ قال: تدرين على ما حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه أحمد والبيهقي

অর্থাৎ, একদা নবী ﷺ বললেন, "(হে আয়েশা!) তুমি কি জানো, ওরা (ইয়াহুদীরা) আমাদের প্রতি কীসের হিংসা করে?" তিনি বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই বেশি জানেন।' নবী ﷺ বললেন, "ওরা ক্বিবলাহ---যা

আমাদেরকে সঠিকরূপে দান করা হয়েছে, কিন্তু ওরা এ ব্যাপারেও ভ্রষ্ট ছিল, জুমআহ---যা আমরা সঠিকরূপে পেয়েছি, আর ওরা পায় নি, আর ইমামের পশ্চাতে আমাদের 'আমীন' বলার উপরে যতটা হিংসা করে, ততটা হিংসা আমাদের অন্যান্য বিষয়ের উপর করে না।" *(আহমাদ, বাইহাক্বী)*

প্রকাশ যে, সূরা ফাতিহার শেষে ইয়াহুদীর উল্লেখ আছে বলেই, তারা ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদীদের 'আমীন' বলা শুনে হিংসা করত।

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'উপস্থিত আমাদের সামনে কেবল ওয়েল বেন হাজার (?) সাহাবির রেওয়ায়েত বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জানি না, বাকী রেওয়ায়াতগুলিকে মুফতী সাহেব কেন দৃষ্টিচ্যুত করেছেন? অতঃপর সেই একই সাহাবী থেকে বর্ণিত বিভিন্নমুখী রেওয়ায়াতের বাছ-বিচার না ক'রেই তার একটি অংশ নিয়েই ফায়সালা দিয়ে বলেছেন যে, 'ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) দ্বিতীয় রাবির হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমীন আস্তে পড়ার ফায়সালা দিয়েছেন। তাই আমরা আমীন আস্তে পড়ি।'

এরই নাম হল তাক্বলীদ। অথচ পাঠকের মনে আরো প্রশ্ন হবে যে, একই সাহাবী ওয়াইল বিন হুজর (অয়েল বেন হাজার নয়) দুই রকম বর্ণনা কীভাবে করতে পারেন? উভয় বর্ণনাই কি ঠিক হতে পারে?

এ বিষয়ে ফায়সালা শুনুন মুহাদ্দিসীনদের। বুখারী প্রমুখ হাদীসের হাফেযগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ বর্ণনায় শু'বাহ রাবীর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তিনি خفض صوته বলেছেন। আসলে ওখানে مد صوته শব্দই হবে। যেহেতু সুফিয়ান শু'বাহ অপেক্ষা বেশি বড় হাফেয। *(মুঅত্ত্বা মুহাম্মাদ, তিরমিযী ২/২৭)*

এবার মুফতী সাহেব নিজেদের মৌলনীতি অনুযায়ী সহীহ হাদীসকে রদ করার নানা তা'বীল পেশ করেছেন।

১। 'আমীন' মানে 'কবুল কর'। তা দুআ। আর দুআ আস্তে করতে হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (৫৫) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(আ'রাফ ঃ ৫৫)*

তার মানে কোন দুআই জোরে পড়া যাবে না। কুনূতের দুআও না।

আল্লাহর নবী ﷺ কোনদিন সশব্দে দুআই করেননি। তাই নাকি?

না। তিনি কুরআনের এই নির্দেশ থাকতেও বহু জায়গায় সশব্দে দুআ করেছেন। যেমন কুনূতে, জুমআর খুতবায় ইত্যাদিতে।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়লেন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন, তখন সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আজকে আপনার নিকট থেকে এমন কথা শুনলাম, যা পূর্বে আমরা শুনতাম না।' তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮-২ নং)*

এ 'আমীন'ও নবী ﷺ জোরে বলেছিলেন। তাছাড়া সূরা ফাতিহাও তো দুআ, সেটাও তাহলে আস্তে বলতে হয়। পাঠক হয়তো বলবেন, 'সেটার ব্যাপারে তো দলীল আছে, জেহরী নামাযে জোরে পড়তে হবে।' তাহলে আমরা বলব, 'এটারও তো দলীল রয়েছে, সূরা ফাতিহার শেষে সশব্দে 'আমীন' বলতে হবে।

২। "যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়, তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া হয়।"

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'ফিরিশ্তাগণ আস্তে আমীন বলেন, তাই আমাদেরকেও আস্তে বলতে হবে---।'

তা জানলেন কীভাবে? ফিরিশ্তার 'গুনজুনি শব্দ' শুনতে না পাওয়া গেলে তাঁরা আস্তেই কথা বলেন বুঝি? আর ফিরিশ্তাগণ জোরে কথা বললে শুনতে পাওয়া যায় বুঝি? আছে আপনার কাছে কোন দলীল? মানুষ বেশে না এলে তাঁদের কোন কথা শোনা যায় কি? জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-কে কোন কথা বললে সাহাবাগণ শুনতে পেতেন কি? রমযানে ফিশি্তাদের আহবান 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)' কেউ শুনতে পায় কি?

“প্রতিদিন সকালে দু’জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।’ আর অপরজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।” *(বুখারী-মুসলিম)* এ কথা কেউ শুনতে পায় কি?

পরন্তু একই হাদীসে রয়েছে “ইমাম যখন ‘আমীন’ বলবে, তখন তোমরাও ‘আমীন’ বল। কারণ, যার ‘আমীন’ বলা ফিরিশ্তাবর্গের ‘আমীন’ বলার এক মতো হয়, তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক’রে দেওয়া হয়।” *(বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

এখানে কি ইমামের জোরে ‘আমীন’ বলার নির্দেশ নেই? তাহলে ফিরিশ্তা জোরে ‘আমীন’ বলেন, না আস্তে বলেন, সে তর্ক কেন?

তাছাড়া হাদীসে উল্লিখিত মুক্তাদী ও ফিরিশ্তার ‘আমীন’ বলার অভিন্নতা জোরে না আস্তের ব্যাপারে নয়; বরং তা সময়ের ব্যাপারে।

৩। তৃতীয় দলীল হিসাবে মুফতী সাহেব উমার ﷺ-এর উক্তি পেশ করেছেন। অনুরূপ বর্ণিত আছে ইবনে মসউদ ﷺ থেকেও।

কিন্তু এ আষার দু’টি হাদীসের কোন কিতাবে নেই। জানা যায় না যে, তা সহীহ না যয়ীফ। অথচ তা দলীল মেনে সহীহ হাদীসকে মনসূখ করার দাবী। ইবনে হায্ম (রঃ) বলেছেন, ‘ওরা উমার বিন খাত্ত্বাব ও ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র তাক্বলীদকে প্রাধান্য দিয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির কাছে আর কারো কথায় কোন হুজ্জত নেই।’ *(মুহাল্লা ৩/২৬৪)*

পরন্তু অহাদীস গ্রন্থে উভয় সাহাবী হতে এর বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে। জানি না, মুফতী সাহেবরা হয়তো সেগুলিকেও ‘মনসূখ’ বলবেন।

عن ابن مسعود أنه قال : من السنّة أن لا يخفي الإمام أربعاً ؛ سبحانك اللّهم، والاستعاذة ، وقراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم ، والتأمين.

অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, ‘সুন্নত এই যে, ইমাম চারটি জিনিস চুপেচুপে বলবে না ঃ (১) সুবহানাকাল্লাহুম্মা.... (২) আঊযু বিল্লাহ.... (৩) বিসমিল্লাহ.... (৪) আমীন। *(ক্বূতুল ক্বুলূব ২/৩৫৫)*

عن عمر بن الخطاب أنه قال : « لا يخفي الإمام أربعا : التعوذ ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين ، وربنا ولك الحمد »

অর্থাৎ, উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেছেন, ‘ইমাম চারটি জিনিস চুপেচুপে বলবে না ঃ (১) আঊযু বিল্লাহ.... (২) বিসমিল্লাহ.... (৩) আমীন ও (৪) রাব্বানা লাকাল হামদ। *(ইনস্বাফ, ইবনে আব্দুল বার্র ১/৩৬)*

প্রিয় পাঠক! এই শ্রেণীর পরস্পর-বিরোধী উক্তি বর্জন ক’রে রসূল ﷺ-এর হাদীস মেনে নেওয়া কি জরুরী নয়?

তাছাড়া তাতে মনে প্রশ্নও সৃষ্টি করে, ঐ ৪টি ছাড়া বাকীগুলি কি জোরে পড়তে হবে অথবা আস্তে পড়তে হবে?

৪। ‘সামুরাহ বিন জুন্দুব থেকে বর্ণিত, হুজুর যখন অলাদ্দলীন পড়তেন, তখন চুপ থাকিতেন। কেননা এখানে আমীন বলতেন।’

চমৎকার দলীল! আমরা পাঠকের খিদমতে সেই বর্ণনা পেশ করছি,

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’ জায়গায় চুপ থাকতেন। (১) যখন তিনি নামায শুরু করতেন এবং (২) যখন তিনি রুকূর আগে দ্বিতীয় সূরা পড়া শেষ করতেন। *(আহমাদ ২০১৬৬নং, প্রমুখ)*

عن الحسن عن سمرة قال : كان لرسول الله ﷺ سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة.

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’ জায়গায় চুপ থাকতেন। (১) যখন তিনি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ পড়তেন এবং (২) যখন তিনি ক্বিরাআত পড়া শেষ করতেন। *(দারাকুত্বনী ২৮নং, প্রমুখ)*

عن الحسن عن سمرة بن جندب : سكتتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال فيه قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان ؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} .

অর্থাৎ, হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মনে রেখেছি যে, তিনি দু’ জায়গায় চুপ থাকতেন।’ বর্ণনাকারী

বলেন, ‘আমরা ক্বাতাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে জায়গা দু’টি কী কী?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যখন তিনি নামাযে প্রবেশ করতেন এবং ক্বিরআত শেষ করতেন।’ পরবর্তীতে তিনি (ক্বাতাদাহ) বলেছেন, ‘যখন তিনি গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযযা-ল্লীন বলতেন।’ *(আবূ দাউদ ৭৮০, তিরমিযী ২৫১নং, প্রমুখ)*

সুধী পাঠক! বর্ণনাগুলি আবারও পড়ে দেখুন, ‘কেননা এখানে আমীন বলতেন’ কথাটি কি হাদীসে আছে? তাঁর চুপ থাকার কারণ তিরমিযীর বর্ণনায় আছে,

وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.

অর্থাৎ, তিনি ক্বিরাআত শেষে চুপ থাকতে পছন্দ করতেন, যাতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করছেন যে, দ্বিতীয় চুপটির ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের মতভেদ রয়েছে, তা সূরা ফাতিহার পরে, নাকি দ্বিতীয় সূরা পড়ার পরে? আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, “অধিকাংশ উলামা বলেন, সে চুপ সমস্ত ক্বিরাআত শেষ হওয়ার পরে। আর এটাই সঠিক; যেমন আমি আত্তা’লীকুল জিয়াদ ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। বিষয়টি ইবনুল ক্বাইয়েমের ‘রিসালাতুস স্বালাহ’ বইয়েও দেখুন।

তাছাড়া (সামুরার) এ হাদীসটির (সনদ) ছিন্নতার দোষে দুষ্ট। যেহেতু তা সামুরাহ থেকে হাসানের বর্ণনা। যদিও হাসান তাঁর নিকট থেকে মোটামুটি হাদীস শুনেছেন। কিন্তু তিনি ‘মুদাল্লিস’ রাবী। আর এ হাদীস তিনি ‘আন’ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিজ কানে শুনেছেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি। সুতরাং হাদীসটি ‘যয়ীফ’ প্রমাণ হয়।” *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৮৭পৃঃ, সিঃ যয়ীফাহ ৫৪৭নং)*

৫। ইব্রাহীম নখয়ীর ফতোয়া ছিল, পাঁচটি জিনিস ইমাম আস্তে বলবে, তার মধ্যে ‘আমীন’ একটি।

কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে অন্য কিতাবে। যেখানে ঐ পাঁচটি জোরে পড়তে বলা হয়েছে।

عن إبراهيم ، قال : « خمس يجهر بها الإمام : سبحانك اللهم وبحمدك ، والتعوذ ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين ، واللهم ربنا ولك الحمد ».

(ইনস্বাফ, ইবনে আব্দুল বার্র ১/৩৯)

বলা বাহুল্য, হাদীসের বিপক্ষে কারো ফতোয়া আমাদের দলীল নয়।

এখানে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর কথা উদ্ধৃত করা জরুরী মনে হয়। তিনি বলেছেন,

إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن رسول الله ﷺ أخذناه وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا ولم نخرج من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.

অর্থাৎ, সহীহ সনদে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে কোন হাদীস এলে আমরা তা গ্রহণ করব। তাঁর সাহাবাগণ থেকে (আষার) বর্ণিত হলে তা আমরা নির্বাচন করব এবং তাঁদের উক্তির বাইরে আমরা যাব না। আর তাবেঈন থেকে (ফতোয়া) এলে আমরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। *(আল-জাওয়াহিরুল মুযীআহ ২/২৫০)*

অবশ্য পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাহলে ইমাম (রঃ) সহীহ হাদীস-বিরোধী মযহাব এখতিয়ার করলেন কেন?

নিশ্চয় তাঁর কোন ওজর ছিল। হয়তো বা সহীহ বর্ণনা তাঁর কাছে পৌঁছেনি। যে বর্ণনা তাঁর কাছে পৌঁছেছে, তাই দিয়ে ফায়সালা দিয়ে গেছেন। নচেৎ তিনিও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)এর মত ‘আমীন’ সশব্দে বলারই ফায়সালা দিতেন।

৬। মুফতী সাহেব লিখেছেন, ‘জোরে আমীন বলা পূর্ব যুগে ছিল অবশ্যই পরে উপরল্লেখিত কুরানের আয়েত এবং হাদীস দ্বারা ওই হুকুম মনসুখ বা বাকি ছিল না ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গয়ের মুকাল্লিদরা বলে জোরে আমীন বলার হুকুম হুজুরের শেষ জীবন পর্যন্ত বাকি ছিল। যদি তাই হয় তবে হুজুর শেষ জীবন পর্যন্ত জোরে আমীন বলে ছিলেন দলীল পেশ করূন। তবেই তো হবে বাপের বেটা!’

চ্যালেঞ্জার মুফতী সাহেব এইভাবে বহু জায়গায় দম্ভ প্রকাশ করেছেন। আবার লাখ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। যেহেতু তা দিতে হবে না তো। কেননা তিনি তাতে ‘শর্তে তা’জীযী’ (অসাধ্য শর্ত) আরোপ করেছেন। আমাদের কেউ যদি অনুরূপ শর্তে আস্তে ‘আমীন’ বলার প্রমাণ দাবী ক’রে পুরস্কার ঘোষণা করে, তাহলে তাঁরা পারবেন কি?

আসলে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে এমন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলেই মুফতী সাহেবদের এমন সতর্কতামূলক কৌশলময় তৎপরতা।

প্রিয় পাঠক! মনসূখ হওয়ার এই দাবীর সাথে কারখীর কথাকে মিলিয়ে নিন। ‘যে আয়াত ও হাদীস আমাদের মযহাবের খেলাপ, তা মনসূখ অথবা

ব্যাখ্যেয়।'

অথচ (ক) কুরআনের আয়াতে আম নির্দেশ এসেছে। যে নির্দেশকে খোদ নবী ﷺ বহু স্থলে খাস করেছেন এবং সশব্দে দুআ করেছেন। অতএব তা 'নাসেখ' হতে পারে না। খোদ তথাকথিত আহলে সুন্নতরাই জামাআতী মুনাজাতে কুরআনের ঐ নির্দেশ মান্য করেন না।

(খ) কোন যয়ীফ হাদীস সহীহ হাদীসের 'নাসেখ' হতে পারে না। পরন্তু মুফতী সাহেব 'হাদীস' বলতে 'আষার' বুঝিয়েছেন।

(গ) কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত আমল বা কথা রসূল ﷺ-এর নির্দেশকে মনসূখ করতে পারে না।

(গ) আবূ হুরাইরা ﷺ-এর হাদীসে كان শব্দ এসেছে। তার মানে তিনি বরাবর জোরে 'আমীন' বলতেন।

(ঘ) ওয়াইল বিন হুজর সাহাবী নবী ﷺ-এর শেষ জীবনে ৯ অথবা ১০ হিজরীতে ইয়ামান থেকে আগমন করেন। সুতরাং তাঁর নামাযের বর্ণনাই প্রমাণ করছে যে, সশব্দে 'আমীন' বলা মনসূখ হয়নি। বরং নবী ﷺ শেষ জীবনে সশব্দে 'আমীন' বলেছেন।

(ঙ) জোরে 'আমীন মনসূখ নয় বলেই নবী ﷺ-এর পরেও সে আমল অবশিষ্ট ছিল। যেমন আবূ হুরাইরা ইমামের পিছনে জোরে 'আমীন' বলতেন। *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৭৮)*

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আত্বা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইবনে যুবাইর 'আমীন' বলতেন কি?' উত্তরে আত্বা বললেন, 'হ্যাঁ, আর তাঁর পশ্চাতে মুক্তাদীরাও 'আমীন' বলত। এমনকি ('আমীন'-এর গুঞ্জরণে) মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠত।' *(আব্দুর রায্যাক ২৬৪০নং, মুহাল্লা ৩/৩৬৪, বুখারী তা'লীক, ফাতহুল বারী ২/৩০৬)*

ইবনে উমার ইমাম অথবা মুক্তাদী উভয় অবস্থাতেই জোরে 'আমীন' বলতেন। *(বাইহাক্বী ২/৫৯)*

ইকরামা বলেছেন, 'আমি লোকেদেরকে পেয়েছি, তাদের 'আমীন' বলার শব্দে কলরব হতো।' *(মুহাল্লা ৩/২৬৪)*

এত দলীল পাওয়ার পরে মুফতী সাহেব যদি ইনসাফ করতেন, তাহলে নিজে না মানলেও চ্যালেঞ্জ না ক'রে সুবিজ্ঞ উদারপন্থী আলেমদের মতো বলতে বাধ্য হতেন,

والانصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل.

অর্থাৎ, ইনসাফ এটাই যে, জোরে 'আমীন' বলার অভিমতটা দলীলের

দিক থেকে বলিষ্ঠ। *(মওলানা আব্দুল হাই লখনবী, আত-তা'লীকুল মাজীদ ১০৩পৃঃ, দীনুল হাক্ব ৩৩১পৃঃ)*

নামাযে হাত কোথায় বাঁধবেন?

মুফতী সাহেব (৫৪ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'বুকের উপর হাত বেঁধে নামাজ পড়া সম্পর্কে সমস্ত হাদীসের কেতাবে যদি উকুন তল্লাসি করে খোঁজা যায় তো কেবল তিনটি হাদীস পাওয়া যায় আর প্রত্যেকটি মুতাকাল্লাম ফিহ্হদীস।......বুকের উপর হাত বাঁধা দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।'

আবার ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আপনাদের নীতির চিহ্ন অর্থাৎ বুকে হাত বাঁধা, বুখারী তো দূরের কথা হাদীসের ছয়টি কেতাবেও নেই।'

মুফতী সাহেব (৫৪ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি শুদ্ধ হাদীস।'

মযহাবী দ্বন্দ্বে এই শ্রেণীর দাবী একটি বড় সমস্যা। কেউ কি নিজের ঘোলকে টক বলতে চায়? আর তখন কি কোন আপোস করা সম্ভব হয়? নিশ্চয় না।

মুফতী সাহেব তো নিজেদের দাবী পেশ করেছেন। এখন আমরা আমাদের দাবী পেশ করি।

প্রথমতঃ বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস ঃ-

১। ওয়াইল বিন হুজর ﷺ

١. عن وائل بن حجر قال : حضرت رسول الله ﷺ إذا أو حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره. رواه البيهقي

ওয়াইল বিন হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি মসজিদের দিকে শীঘ্র যাচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি মিহরাবে প্রবেশ করলেন অতঃপর তকবীর দিয়ে দুই হাত তুললেন। অতঃপর তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর বুকের উপর রাখলেন। *(বাইহাক্বী)*

٢. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي ﷺ وضع يمينه على شماله ، ثم وضعهما على صدره. أخرجه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " (ص ١٢٥)، والبيهقي

ওয়াইল বিন হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর বুকের উপর রাখলেন। *(আবুশ শায়খ, তারীখে আসবাহান, বাইহাক্বী)*

মুফতী সাহেবের দাবী হল, হাদীসগুলি 'মুতাকাল্লাম ফীহ হাদীস'। তা হলেই যে হাদীস সর্বসাকুল্যে 'যয়ীফ' হয়ে যাবে---তা তো নয়। মুহাদ্দিসীন তথা হাদীস-বিশারদদের নিকট 'শাওয়াহিদ ও মুতাবাআত' (সাপোর্ট ও সমর্থন) দ্বারা যে কোন 'নরম বর্ণনাকারী'র হাদীস 'হাসান' বা 'সহীহ'র দর্জায় পৌঁছে যায়, তা অবশ্যই আপনার জানা আছে। আহলে হাদীসের নিকট তাই ওয়াইল বিন হুজরের বুকে হাত বাঁধার হাদীস সহীহ।

অবশ্য আহলে হাদীসরা বুকে হাত বাঁধে বলে ঐ হাদীসকে 'সহীহ' প্রতিপাদন করছে না। বরং হাদীস সহীহ বলেই তারা বুকে হাত বাঁধে। পক্ষান্তরে আপনারা হাদীস 'যয়ীফ' বলে ঐ হাদীসকে 'যয়ীফ' বলছেন না, বরং নাভির নিচে হাত বাঁধেন বলেই বলছেন। প্রিয় পাঠক! এ পার্থক্য নিশ্চয় বুঝেছেন মুক্বাল্লিদ ও গায়র মুক্বাল্লিদদের মাঝে।

٣. عن وائل بن حجر ﷺ قال : قلت لأنظرن إلى رسول الله ﷺ كيف يصلي فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.....

ابن الجارود، أبوداود، والنسائي، ابن حبان، ابن خزيمة، أحمد

ওয়াইল বিন হুজর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই দেখব, রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে নামায পড়ছেন। সুতরাং তিনি তকবীর দিলেন এবং নিজ কান বরাবর দুই হাত তুললেন। অতঃপর তাঁর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতের চেটো, কব্জি ও রলার উপর রাখলেন। *(বাইহাক্বী)*

এ হাদীসও আহলে হাদীসের কাছে সহীহ। এ হাদীসে বুকের উপরে রাখার কথা স্পষ্টতঃ না থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। যেহেতু কনুই পর্যন্ত রলার উপর হাত রাখলে বুকের উপর ছাড়া রাখা সম্ভব নয়।

২। হুল্ব ﷺ (হালব নয়)

قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه قال : رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره . وصف يحيى : اليمنى على اليسرى فوق المِفصل . رواه أحمد

হুল্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ডান

দিকে ও বাম দিকে ফিরতেন। আর আমি তাঁকে দেখেছি, এই (ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে) তাঁর বুকের উপর রেখেছেন। *(আহমাদ)*

এ হাদীসও 'মুতাকাল্লাম ফীহ' হলেও 'শাহেদ'রূপে হাসান অথবা সহীহ। আর বুকে হাত রাখার কথা কাতেবের বাড়িয়ে নেওয়ার দাবী কেবল দাবীই মাত্র। যেহেতু তার সাক্ষ্য অন্য হাদীসে মজুদ রয়েছে।

৩। সাহল বিন সা'দ ﷺ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رواه مالك، البخاري، الطبراني، البيهقي

সাহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদেরকে আদেশ করা হতো যে, লোক নামাযে ডান হাতকে তার বাম হাতের নলার উপর রাখবে। *(মালেক, বুখারী ৭৪০নং, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী)*

এ হাদীস সহীহ হওয়াতে কারো কোন সন্দেহ নেই। তবে এতে বুকে হাত রাখার কথা স্পষ্ট নয়। তা না হলেও নলার উপর হাত রাখলে বুকের উপরেই রাখা হবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪। ত্বাউস (রঃ)

عن طاوس قال : كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. رواه أبو داود

ত্বাউস বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নামায অবস্থায় নিজ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে তাঁর বুকের উপর রাখতেন। *(সুনানে আবূ দাঊদ ৭৫৯নং)*

মুফতী সাহেব আহলে হাদীসের কোন আলেম-উলামা বা শ্রদ্ধেয়ভাজন মুসলমানদের কথা খেয়াল না করেই বড় বড়ত্বের সাথে বলেছেন, 'হে গয়ের মুকাল্লিদের দল তোমরা মুরসাল হাদীসকে মাননা তো তোমরা কিভাবে এই হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করো।'

আমরা বলি, হে মাননীয় মুফতী সাহেব! আহলে হাদীস মারফূ হাদীসের বিপক্ষে কোন মুরসাল হাদীস মানে না ঠিকই, তবে যদি সে হাদীস অন্য কোন কিতাবে 'মাওসূলান' বর্ণিত হয় অথবা তার কোন 'শাহেদ' থাকে তাহলে তা পেশ করতে কোন সমস্যা থাকে না। যেমন এখানে এই সহীহ মুরসালের 'শাহেদ' রয়েছে উপর্যুক্ত মারফূ হাদীসসমূহ।

তাছাড়া বাংলা প্রবাদে আছে, 'যার সিল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গ দাঁতের গোড়া।' তাই গায়র মুক্বাল্লিদরা ত্বাউস (রঃ)-এর ঐ বর্ণনা পেশ ক'রে থাকে,

যেহেতু মুক্বাল্লিদরাও অনুরূপ মুরসাল হাদীস পেশ ক'রে থাকেন। নচেৎ আহলে হাদীসের জন্য এ ব্যাপারে একটি 'মারফূ' হাদীসই যথেষ্ট।

অতঃপর মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'বোঝা গেল গোনা চোনা এই কয়েকটি হাদীস বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে পাওয়া যায় আর প্রত্যেকটি দুর্বল।'

আমরা বলি, আপনার এ মুহাদ্দিসানা দাবী সত্য নয়। যেমন আমাদের দাবী পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

তারপর লিখেছেন, 'এইরূপ দুর্বল হাদীস দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধার উপর জবরদস্তি এবং যারা বাঁধে না তাদের সম্বন্ধে কু-সমালোচনা করা কি মানবতার পরিচয় হয়?'

আসলে মুফতী সাহেব, আমরা মনে করি, আমরা সুপথ পেয়েছি। যদি অন্য কেউও পায়। তাই সত্য বয়ান করা হয়। এটাই ঈমাদারীর দাবী। যেহেতু আমাদের নবী ﷺ বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অবশ্য তার জন্য 'জবরদস্তি' বা 'কু-সমালোচনা' করা কোন জ্ঞানী আহলে হাদীসের কাজ নয়। যখন কোন কাফেরকে মুসলিম বানানোর জন্যই কেউ জবরদস্তি করতে পারে না, তখন নাভির নিচে থেকে বুকের উপর হাত তোলার জন্য জবরদস্তি কীভাবে জায়েয হতে পারে?

তারপর মুফতী সাহেব (৫৯ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে......সর্ব মোট শুদ্ধ এবং দুর্বল ছয়টি হাদীস পাওয়া যায়।'

প্রিয় পাঠক! ইতিপূর্বে (৫৫ পৃষ্ঠায়) মুফতী সাহেব বলেছেন, 'নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি শুদ্ধ হাদীস।'

ওখানে বললেন, 'অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।' আর এখানে বললেন, 'ছয়টি হাদীস পাওয়া যায়।'

অসংখ্য মানে অগণিত, যা সংখ্যা দিয়ে নিরূপণ করা যায় না, গুণে শেষ করা যায় না। আর এখানে বললেন, মাত্র ছয়টি। এ যেন সেই প্রাচীন 'জঙ্গনামা'র মতো অত্যুক্তি,

'লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কাটে বেশুমার,
অবশেষে গুনে দেখি, তিনকুড়ি চার!'

ওখানে বললেন, 'প্রত্যেকটি হাদীস শুদ্ধ।' আর এখানে বললেন, 'শুদ্ধ এবং দুর্বল।'

তাহলে নিশ্চয় প্রথম কথাটি চ্যালেঞ্জার সাহেবের ঝুটা দাওয়া। আসলে এমন স্ববিরোধিতা সাধারণতঃ আস্ফালনকারীদেরই হয়ে থাকে।

এবারে মুক্বাল্লিদদের ঐ ছয়টি দলীলের কথায় আসা যাক। পাঠক বুঝতেই পেরেছেন, মুফতী সাহেবও স্বীকার করেন, সবগুলি সহীহ নয়। আমরা বলি, তার কোনটাই সহীহ নয়।

১। ওয়াইল বিন (হাজার নয়) হুজরের হাদীস, যা সহীহ, তা বুকের উপর হাত বাঁধার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। মুফতী সাহেব উল্লেখ করেছেন ইবনে আবী শাইবার হাওয়ালায়। সেখানে কিন্তু ঐ হাদীসে বুকের উপর অথবা নাভির নিচে হাত বাঁধার কথা নেই। যেটা আছে, সেটা নিম্নরূপ ঃ-

عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة.

অর্থাৎ, ওয়াইল বিন হুজ্র বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি নামাযে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৪২৭)*

২। আলী ﷺ-এর হাদীস।

عن علي من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة.

অর্থাৎ, নামাযে একটি সুন্নত হল করতলের উপর করতল রেখে নাভির নিচে রাখা। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

এ হাদীসেও নবী ﷺ নাভির নিচে হাত বাঁধতেন সে কথা নেই। তবুও কোন সাহাবী 'সুন্নত' বললে সেটাকে নবী ﷺ-এর কর্ম বলেই মানা হয়। কিন্তু তা সহীহ হলে তবে তো?

শুধু গায়র মুক্বাল্লিদরা নয়, মুক্বাল্লিদ আলেমগণও তা 'অশুদ্ধ' বলেন।

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, 'সকলেই এর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত।'

আল্লামা আইনী বলেছেন, 'এটি আলী বিন আবী তালেবের উক্তি। নবী ﷺ পর্যন্ত এর সনদ সহীহ নয়।

পক্ষান্তরে আলী رضي الله عنه কর্তৃক এর বিপরীত বর্ণনাও এসেছে। যেমন ঃ-

عن ابن جَرِير الضَّبِّيِّ عن أبيه قال : رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . وهذا إسناد قال البيهقي (٣٠/٢) : "

حسن " .

অর্থাৎ, জারীর য্বাব্বী বলেন, 'আমি আলী رضي الله عنه-কে দেখেছি, তিনি নিজ ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিকে ধরে নাভির উপরে রেখেছেন।' *(আবূ দাঊদ, বাইহাক্বী এর সনদকে 'হাসান' বলেছেন।)*

عن عُقْبة بن صُهْبان قال : إن علياً رضي الله عنه قال في هذه الآية : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، قال : وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ، ثم وضعهما على صدره . أخرجه البيهقي (٢/٣٠) .

উক্ববাহ বিন সুহবান বলেন, আলী رضي الله عنه 'ফাস্বাল্লি লিরাব্বিকা অন্হার' আয়াতের অর্থ বর্ণনায় বলেন, '(তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় এবং বুকে হাত রাখো।) তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের মাঝে রেখে নিজ বুকের উপর রাখলেন। *(বাইহাক্বী ২/৩০)*

৩। আবূ হুরাইরা رضي الله عنه

عن أبي وائل قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.

অর্থাৎ, নামাযে হাতের চেটোকে হাতের চেটো দিয়ে ধরে নাভির নিচে রাখা। *(আবূ দাঊদ)*

যে কারণে আলী رضي الله عنه-এর হাদীস যয়ীফ, সেই কারণেই এটিও যয়ীফ।

৪। আনাস رضي الله عنه

ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة تحت السرة.

অর্থাৎ, তিনটি জিনিস নবুঅতের আচরণ ঃ সত্বর ইফতার করা, দেরী ক'রে সেহরী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে রাখা।

এটি একটি সনদহীন আষার। যা দলীলযোগ্য নয়। *(দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭৮)*

পক্ষান্তরে উক্ত বর্ণনা আবু দার্দা رضي الله عنه কর্তৃক নবী ﷺ হতে ত্বাবারানীতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে 'নাভির নিচে' কথাটি নেই। *(দেখুন ঃ সহীহুল জামে' ৩০৩৮-নং)*

৫। ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ)

عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

ইব্রাহীম বলেছেন, (নামাযী) নামাযে নিজের ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে রাখবে। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

বুঝতেই পারছেন, এটা কিন্তু হাদীস নয়। তাছাড়া এর সনদে রয়েছে রাবী' বিন স্বাবীহ দুর্বল রাবী।

৬। আবূ মিজলায (রঃ)

حجاج بن حسان قال : سمعت أبا مجلز أو سألته قال : قلت كيف يصنع قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.

এটিও কোন হাদীস নয়। একটি ফতোয়া। হাজ্জাজ বিন হাস্সান বলেন, আমি আবু মিজলাযকে বলতে শুনেছি অথবা আমি তাঁকে (হাত বাঁধার ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলাম যে, (নামাযী) কী করবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তার বাম হাতের চেটোর উপরে ডান হাতের তেলোকে রাখবে এবং তা নাভির নিচে স্থাপন করবে।' *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

শ্রদ্ধেয় পাঠক! কিন্তু মুফতী সাহেবের বিভ্রান্তি দেখুন, তিনি অনুবাদ করেছেন, 'হজরত আবু মিজলাজ বলেন হুজুর (সাঃ) ডান হাতের বাতিন হিস্যাকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে রাখতেন।'

একটি ফতোয়াকে তিনি 'হাদীস' তথা নবী ﷺ-এর কর্মের রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন, যা নেহাতই দুঃখজনক।

পরন্তু তাঁর ফতোয়ায় নাভির উপরে হাত বাঁধার কথাও আছে। *(দেখুন ঃ বাইহাক্বী ২/৩১)* বলা বাহুল্য, মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় তাবেঈর উক্তি বা ফতোয়া 'দলীল' হতে পারে না।

সুধী পাঠক! নিশ্চয় খেয়াল করেছেন যে, মুফতী সাহেবের অসংখ্য হাদীসের মধ্যে ৬টি, আর তার মধ্যে মাত্র একটি (আলীর) হাদীসকেই 'হাদীস' বলা যায়। বাকীগুলি আসলে 'আষার' ও ফতোয়া।

তিনি নিজেদের মযহাব-সমর্থক হাদীসের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। যেহেতু তিনি মনে করেন, তার সবগুলিই সহীহ। তবুও মান রাখার জন্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'ছয়টি হাদীসের মধ্যে কিছু দুর্বল থাকলে....।'

অতঃপর তিনি নাভির নিচে হাত বাঁধার যৌক্তিকতা পেশ করেছেন। যদিও দলীলের সাথে কোন যুক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি বলেছেন,

(ক) 'নাভির নিচে হাত বাঁধাকে বেশি সম্মান দেখা যায়।'

জানি না, নিরপেক্ষ পাঠক কী মনে করেন? কোন সম্মানী ব্যক্তির সম্মুখে

দাঁড়াতে হলে নাভির নিচে হাত বেঁধে দাঁড়ালে বেশি আদব ও সম্মান প্রকাশ পায়, নাকি বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ালে? লজ্জাস্থানের উপর হাত রেখে দাঁড়ানোতে বেশি আদব আছে, নাকি হৃদয় ও বুকে হাত রেখে দাঁড়ানোতে? কোন্ অবস্থাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বেশি বিনম্র, ভয়ার্ত ও বিনয়ী লাগে?

তাছাড়া বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ালে যদি 'অসম্মান' দেখায়, তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে কি সেই অসম্মান দেখায় না?

বিচার-ভার পাঠকের উপর।

(খ) 'স্ত্রীলোকদের মুসা বাহাত বা স্ত্রীলোকদের মত দেখায় না।'

অর্থাৎ, হানাফী স্ত্রীলোকেরা বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়ে। সুতরাং পুরুষ-লোকেরাও বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়লে 'মুশাবাহাত' বা আনুরূপ্য প্রকাশ পায়। অথচ 'আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী)*

পাঠক হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন যে, তাহলে কি মুক্বাল্লিদদের মহিলারা এ ব্যাপারে আহলে হাদীস?

না-না, তা নয়। তারা আসলে হাদীস মান্য ক'রে বুকে হাত বাঁধে না। বরং 'ফেকা' মান্য ক'রে পর্দা করার জন্য।

পরন্তু আপনি খেয়াল ক'রে দেখুন, পর্দা তো চাদরেই হয়ে যায়। তাছাড়া মযহাবীদের স্ত্রী লোকেরা যখন বুকে হাত বেঁধে নামায পড়ে, তখন হানাফীদের পুরুষদের 'মুশাবাহাত' বা সাদৃশ্য থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু শাফেয়ী বা আহলে হাদীস পুরুষদের 'মুশাবাহাত'-এ পতিত হয়।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, খাস দলীল ছাড়া নারী-পুরুষ উভয়ের নামায-পদ্ধতি এক। কারণ, (নারী-পুরুষ উভয় জাতির) উম্মতকে সম্বোধন ক'রে রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেইরূপ নামায পড়, যেরূপ আমাকে পড়তে দেখেছ।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮৩নং)*

(গ) মুফতী সাহেবের এ ব্যাপারে শেষ যুক্তি হল, 'নাভির নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যত হাদীস এসেছে তার সংখ্যাও বেশি।'

সুধী পাঠক! আপনার উপর রইল গণনার ভার। আর কী বলার আছে বলুন?

পরিশেষে মুফতী সাহেব চ্যালেঞ্জে মওলানা অমৃতসরীর ব্যাপারে লিখেছেন, 'তাঁর ফাতাওয়া সানাইয়া নামক কেতাবের খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৪৩ তে লিখেছেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে বহু হাদীস বুখারী এবং

মুসলিম শরীফ এবং উহার শারাহ কেতাবে বর্ণিত হয়েছে।'

মুফতী সাহেবের নকলের আমানতে খিয়ানত হয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। আসলে অমৃতসরী সাহেব লিখেছেন, 'সীনে পর হাথ বাঁধনে আওর রফয়ে য়্যাদাইন করনে কী রেওয়ায়াত বুখারী আওর মুসলিম আওর উনকী শরূহ মেঁ বাকাষরত হ্যাঁয়।'

সুতরাং তিনি কেবল 'বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস বুখারী-মুসলিমে আছে'---সে কথা বলেননি, যেমন মুফতী সাহেব বুঝেছেন। অবশ্য তিনি সে ব্যাপারে বুখারী ও নাসাঈর হাওয়ালা দিয়েছেন। আর সে হাদীস সনদ-সহ নিম্নরূপ ঃ-

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ. قال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. (رواه البخاري برقم ٧٠٧)

أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.....(رواه النسائي برقم ٨٨٩)

হাদীসদ্বয়ের অর্থ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ফাল্লাহুল হাদী ইলা সাওয়াইস সাবীল।

রফয়ে য়্যাদাইন

মুফতী সাহেব লিখেছেন, হাত তোলা বা না তোলার ব্যাপারে দুই শ্রেণীরই হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাই মতভেদ। '(মুজতাহিদগণ) এটাও বলেছেন যে দুই প্রকার হাদীস গুলোর মধ্যে চিন্তার সহিত দৃষ্টিপাত করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর নবী ﷺ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে যখন মানুষের অন্তরে শেরেক এবং কুফরে ভরে ছিল তাদের অন্তর থেকে ওই

গুলোকে পরিস্কার করে আল্লাহর বড়ত্ব এবং মহত্ব আনয়ন করার জন্য রফয়ে এদাইন করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষার্থের জন্য নিজেই করে দেখিয়েছিলেন।’

পাঠক হয়তো মুফতী সাহেবের উক্ত উক্তি পড়ে অবাক হবেন ও প্রশ্ন করবেন যে, রফয়ে য়্যাদাইনের সাথে মানুষের অন্তরের শির্ক ও কুফ্‌রের কী সাথ?

রফয়ে য়্যাদাইন দ্বারা শির্ক ও কুফ্‌র দূর করা হয়েছে কীভাবে?

রফয়ে য়্যাদাইন করতে নবী ﷺ আদেশ দিয়েছিলেন, আছে কি এমন কোন বর্ণনা?

রফয়ে য়্যাদাইন দ্বারা কোন্ মানুষের মন থেকে শির্ক ও কুফ্‌র দূর করা হয়েছিল? তারা অমুসলিম, না মুসলিম ছিল?

রফয়ে য়্যাদাইন তো নামাযে হয়, তাহলে কী নামাযী সাহাবাদের অন্তরেও শির্ক ও কুফ্‌র ছিল? তাঁরা মুসলিম হয়েও মুশরিক ও কাফের ছিলেন?

‘পরবর্তীকালে যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব এবং মহত্ব বসে গেল তখন আর বার বার হাত তোলার প্রয়োজন ছিল না।’

কীভাবে তা বসে গেল যে, বারবার হাত তোলার প্রয়োজন থাকল না, বরং নামাযের শুরুতে একবার থাকল মাত্র? তাহলে সেই একবার তোলাটাই বা আর কোন্ প্রয়োজনে?

জানাযার তকবীর, ঈদের তকবীর, কুনূতের তকবীরের সময়ই বা রফয়ে য়্যাদাইন কোন্ প্রয়োজনে?

এক শ্রেণীর বিকৃত-প্রকৃতির চিন্তাবিদ রয়েছেন, যাঁরা রফয়ে য়্যাদাইনের যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন, ‘সাহাবীরা বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) ভরে রেখে নামায পড়তেন! কারণ ইসলামের শুরুতে তখনও তাঁদের মন থেকে মূর্তির (বা মদের বোতলের) মহব্বত যায় নি। তাই নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বারবার হাত তুলতে আদেশ করেছিলেন বা ক’রে দেখিয়েছিলেন। যাতে কেউ আর বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) দাবিয়ে রাখতে না পারে।’ (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

সুধী পাঠক! জানি না, আমাদের মুফতী সাহেব সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন কি না?

একদিকে তিনি মওলানা মওদূদীর উপর খাপ্পা, কারণ তিনি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেছেন। এখন মুফতী সাহেব নিজেই আবার সেই পাপে পা পিছলে পড়ছেন না তো?

তিনি বলতে পারেন, মুনাফিকরা বগলে ঠাকুর রেখে নামায পড়ত,

সাহাবারা নয়। কিন্তু তার দলীল কী? এ কথা কি অনুমান-প্রসূত নয়? তাহলেও নামাযের শুরুতে কেন সেই রফয়ে য়্যাদাইন থেকে গেল, যার প্রয়োজন পরবর্তীতে রইল না?

তাছাড়া পরীক্ষা ক’রে দেখার বিষয় যে, রফয়ে য়্যাদাইনের সাথে সাথে বগল তুলে ফাঁক না করলে মূর্তি বা বোতল পড়বে না। কিন্তু সিজদায় গিয়ে বগল ফাঁক করার কথা আছে, তখন পড়তে পারে। তাহলে মূর্তি ফেলার জন্য উক্ত যুক্তি কি অত্যুক্তি নয়?

নবী ﷺ এত বড় আপত্তিকর কর্মকাণ্ড জেনেও সরাসরি নিষেধ না ক’রে রফয়ে য়্যাদাইনের আদেশ দিলেন---এ কথা বিবেক-অগ্রাহ্য। তাছাড়া রফয়ে য়্যাদাইনের আদেশই তো নেই হাদীসে।

নিরপেক্ষ সুধী পাঠক! ইনসাফ আপনার আদালতে। আমরা কেবল সংক্ষেপে বলতে চাই যে, রফয়ে য়্যাদাইনের সুন্নত ‘মনসূখ’ নয়। যেহেতু কোন দুর্বল হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীস অথবা কোন সাহাবীর আমল দ্বারা নবী ﷺ-এর আমল মনসূখ হয় না।

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه-এর হাদীসকে সহীহ মেনে নিলেও তা ‘নাফী’ (না-বাচক)। আর অন্যান্য সাহাবার হাদীস ‘মুষবিত’ (হ্যাঁ-বাচক)। আর উসূলের নীতিতে ‘আল-মুষবিতু মুক্বাদ্দামুন আলান্-নাফী।’ অর্থাৎ, ‘না-বাচক’ বর্ণনার উপর ‘হ্যাঁ-বাচক’ বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।

অথবা ঐ ‘না-বাচক’ বর্ণনা রফয়ে য়্যাদাইন কখনো কখনো বর্জন করার বৈধতা প্রমাণের জন্য মেনে নেওয়া যেতে পারে।

ওয়াইল বিন হুজ্‌র সাহাবী নবী ﷺ-এর শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাঁর শেষ জীবনেরই আমল বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নামাযে রফয়ে য়্যাদাইন করেছেন। সুতরাং রফয়ে য়্যাদাইন ইসলামের শুরুতে থাকলেও নবী ﷺ-এর জীবনের শেষ দিকেও অবশিষ্ট ছিল।

তাই মনসূখ হওয়ার কথা হক্বপন্থী বড় বড় হানাফী আলেমগণই অস্বীকার করেছেন।

সাহাবাগণ নামাযে সালাম ফিরার সময় হাত দিয়ে ইশারা করতেন। নবী ﷺ তা দেখলে তিনি বললেন, “কী ব্যাপার তোমাদের? দুরন্ত ঘোড়ার লেজের মতো ক’রে হাত দ্বারা ইশারা করছ? যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরবে, তখন সে যেন তার (পার্শ্ববর্তী) সঙ্গীর প্রতি চেহারা ফেরায় এবং হাত দ্বারা ইশারা না করে।” অতঃপর সাহাবাগণ এরূপ ইশারা করা হতে বিরত হয়ে যান। *(মুসলিম প্রমুখ)*

কিন্তু বড় বিস্ময়কর যে, মুফতী সাহেবরা সালাম ফিরার সময় হাত

তুলতে নিষেধের এই হাদীস দিয়ে রুকূর আগে-পরের হাত তোলা নিষেধ হওয়ার দলীল মনে ক'রে থাকেন!

মুফতী সাহেব (৬৯ পৃষ্ঠায়) ইবনে আব্বাসের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন,

كَأَنِّي بقومٍ يأتون مِنْ بعدي يَرْفعونَ أَيْدِيَهم فِي الصلاة كأنها أذناب خَيْلٍ شُمْسٍ.

অর্থাৎ, আমি যেন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পাচ্ছি, যারা আমার পরে নিজেদের নামাযে দুরন্ত ঘোড়ার লেজের মতো ক'রে হাত তুলবে। *(আল-জামেউস স্বাহীহ, মুসনাদুল ইমাম রাবী')*

মুফতী সাহেব যে ইমামের সহীহ গ্রন্থ থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, তাঁকে চেনেন কি না জানি না, তবে তাঁর ঐ কিতাব সম্বন্ধে শায়খ সালেমী ইবাযী বলেছেন, 'কুরআনের পর তা সবচেয়ে সহীহ কিতাব।'

কি জানি মুফতী সাহেব ইবাযিয়াহ ফির্কার এ কথায় ঈমান রাখেন কি না?

তাছাড়া তাতে রুকুর আগে-পরে বা দ্বিতীয় রাকআত থেকে উঠে হাত তোলার কথা নেই। নামাযের শুরুতে যে হাত তোলা হয়, তাও শামিল নয়। শামিল নয় ঈদের নামাযে হাত তোলা। নচেৎ খোদ মুফতী সাহেবও ঐ হাদীসের 'নিসান' হয়ে যাবেন।

হাদীসের রাবী সাহাবী ইবনে আব্বাস ﵁। হাদীসের উদ্দেশ্য মুফতী সাহেবের 'নিসান' হলে তিনি নিজে রফ্‌য়ে য়্যাদাইন করতেন না।

هشيم قال أخبرنا أبو جمرة قال : رأيت ابن عباس يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.

আবূ হামযাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে দেখেছি, তিনি নামাযের শুরুতে, রুকূ যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা তুলে রফ্‌য়ে য়্যাদাইন করছেন।

عن طاوس قال : رأيت عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن الزبير يرفعون أيديهم في الصلاة .

ত্বাউস বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে নামাযে রফয়ে য়্যাদাইন করতে দেখেছি। *(দেখুন ঃ মুস্বান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ইবনে আবী শাইবাহ ১/২৬৬)*

পক্ষান্তরে ইমাম রাবী'র উল্লিখিত ঐ হাদীস 'মুনকার' ও 'বাতিল'। পরন্তু উদ্দেশ্য উপরে উল্লিখিত হাদীসের সালাম ফিরার সময় হাত তোলা।

যেহেতু উভয় হাদীসের শব্দাবলী প্রায় কাছাকাছি। আর একটি হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে।

অবশ্য মুফতী ক্বাসেমী সাহেব ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর নিকট থেকে একটি ব্যাখ্যা এই 'বাতিল' হাদীসের নিচে বর্ণনা করেছেন। তিনি বা তাঁরা তো কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন না। মনগড়া ব্যাখ্যা করে আহলে হাদীসরা। তিনি লিখেছেন, 'ইহার অর্থ হল যে তারা রফয়ে এদাইন করাকে পূর্নাঙ্গ দ্বীন মনে করে নেবে এবং রফয়ে এদাইনের আড়ালে তারা নিজে পথ ভ্রষ্ট হবে এবং অন্য কেও পথ ভ্রষ্ঠ করাবেন নিজেরা বদ আকীদা হবে এবং অপর কেও বদ আকীদা তৈরী করাবে!!!!'

তবে ইমাম সাহেব---অথবা চালাক মুফতী সাহেব বড় চালাকির সাথে অধিকাংশ 'রফাদান'কে এই পথভ্রষ্ট দল থেকে ছাঁটাই ক'রে বাদ দিয়েছেন। নচেৎ ধরা পড়ে যাবেন যে। তিনি লিখেছেন, 'তবে এই হাদীসের অন্তর ভুক্ত বা নিসান (?) হজরত ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমাদ নন। কেননা তাঁদের আকীদা ঠিক ছিল তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন।'

তার মানে মুফতী সাহেবের মনগড়া ঐ ব্যাখ্যা-তীরের নিশান কেবল আহলে হাদীস নামক 'গয়ের মুকাল্লিদ'রা। মুক্বাল্লিদরা হাত তুললে এই হাদীসের 'নিসান' থেকে অটোমেটিক পদ্ধতিতে বাদ পড়ে যাবে।

সুধী পাঠক! বুঝতে পারছেন, কারা হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে?

মুফতী সাহেব! আহলে হাদীস সিজদার সময়েও রফ্‌য়ে য়্যাদাইনের হাদীসকে 'মনসূখ' বলে না। কারণ চোখ বুজে মনসূখ বলা তাদের কাছে ততটা সহজ নয়, যতটা আপনাদের কাছে সহজ। তারাও তার উপর কখনো কখনো আমল ক'রে থাকে।

মুফতী সাহেব প্রশ্ন করেছেন, 'রফয়ে এদাইন মনসুখ হওয়ার ব্যাপারে হজরত আব্দুল্লাহ বেন মসউদ (রাঃ) নাসেখ হাদীস কে মানতে বাধা কিসের? আসলে মন চাহি জীবন মিঠা মিঠা হাফ হাফ কাড়ুয়া কাড়ুয়া থু থু।'

উত্তরে বলি, যেহেতু ঐ হাদীস আহলে হাদীসের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া তাতে এ কথা নেই যে, শুরুতে ছিল, পরে রহিত হয়ে গেছে। ঐ দেখুন না, ইবনে উমারের মরফূ হাদীসে রফয়ে য়্যাদাইন প্রমাণিত। কিন্তু মাওক্বূফ হাদীসে এক বর্ণনায় তিনি রফয়ে য়্যাদাইন করতেন না। আর তার জন্য আপনারা তা মনসূখ বলেছেন। কিন্তু অন্য বর্ণনায় তিনি রফয়ে য়্যাদাইন করতেন। তাহলে আপনারাই বা কেন তাঁর মরফূ হাদীস সমর্থক 'হ্যাঁ-বাচক' বর্ণনাকে প্রাধান্য না দিয়ে 'না-বাচক' বর্ণনাকে প্রাধান্য দিলেন? তাহলে আপনারাও কি 'মন চাহি জীবন মিঠা মিঠা হাফ হাফ

কাড়ুয়া কাড়ুয়া থু থু' প্রবাদে শামিল হলেন না? তবে আপনাদের মিঠা হল মযহাব। আর আহলে হাদীসের মিঠা সহীহ হাদীস। আর ফায়সালা য়্যাউমাল ফাস্‌ল।

রফ্‌য়ে য়্যাদাইন মনসূখ হওয়ার চমৎকার উপমা

মুফতী সাহেব মাদ্রাসায় টিউব লাইট কমিয়ে খরচ কম করার মতো রফ্‌য়ে য়্যাদাইনকে মনসূখ প্রমাণ করেছেন। লাইটের গল্প বলার পর (৭০ পৃষ্ঠায়) তিনি বলেছেন, 'ঠিক তদ্রুপ ইসলামের প্রথম যুগে যিনি হুজুরের দরবারে এসেছিলেন তিনি দেখে ছিলেন যে হুজুর প্রত্যেক তকবীরের সময় হাত তুলতেন তিনি আর দ্বিতীয় বার হুজুরের দরবারে আসার সুযোগ পাননি তাই তিনি সরা জীবন ওই রূপ বর্ণনা করে গেছেন......।'

কিন্তু মুফতী সাহেব! ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, নবী ﷺ-এর খাদেম আনাস ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে হুজুরের দরবারে এসেছিলেন, তারপর তাঁরা কোথায় গিয়েছিলেন? তাঁরা কি তাঁর শেষ জীবনে তাঁর আশেপাশে ছিলেন না? ওয়াইল বিন হুজ্‌র প্রমুখ সাহাবী ইসলামের কোন্‌ যুগে নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন?

যদি তাঁরা শেষ জীবনে নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলেন, তাহলে কীভাবে ফায়সালা নিতে পারেন যে, তাঁর শেষ আমল রফ্‌য়ে য়্যাদাইন বর্জন ছিল? নবী ﷺ-এর সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতের উপর কি আহলে হাদীস আমল করে না? তাঁদের কেউই কি রফ্‌য়ে য়্যাদাইন সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেননি? তাহলে দুর্বল বর্ণনা দ্বারা কেন আহলে হাদীসকে 'সুন্নাহ' অমান্যকারী প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন? এটা কি সূর্যকে চাঁদের আলো দেখানোর মতো ব্যাপার হল না সাহেব!

আহলে হাদীসের কল্পিত মূলনীতি

মুনাযির মুফতী সাহেব আহলে হাদীসের ঠিকেদার এক ব্যক্তির সাথে কাল্পনিক মুনাযারা করতে গিয়ে তার কথা (৭৬ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'বুখারী এবং মুসলিম শরীফের প্রতিদ্বন্দ্বি আর দ্বিতীয় কোনো হাদীসের কেতাব মানি না।'

সুধী পাঠক! যদি আহলে হাদীসের বই-পুস্তক পড়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই জানবেন যে, ঐ নীতি আহলে হাদীসের নয়। হাদীস সহীহ হলে যে

কোন হাদীসের কিতাবের হাদীস আহলে হাদীসরা মান্য করে। পরস্পর-বিরোধী হলে প্রাধান্য দেওয়ার যে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, তা প্রয়োগ করে। সুতরাং ঐ নীতিকে মুফতী সাহেব নিজের তর্কনীতি বানিয়ে আহলে হাদীসকে 'দাঁড়িয়ে পেসাব করা ইংরেজ' বলে কটাক্ষ ক'রে আরো কিছু মাসায়েল নিয়ে ফালতু নিজের কলমের কালি, ছাপার টাকা ও পাঠকের সময় নষ্ট করেছেন। এ মর্মে কল্পিত তর্কের অবতারণা ক'রে (৮৩ পৃষ্ঠায়) মুহাদ্দিস আল্লামা নাসেরুদ্দীন আলবানী সাহেব সহ আহলে হাদীসের উলামাকে ইঙ্গিতে 'মিথ্যাবাদী' বলতে কসুর করেননি। আল্লাহু হাসীবুহ।

নামাযে যা জরুরী মসলা নয়, যা কেউ সুন্নত মনে ক'রে পালন করলে সওয়াব পাবে, সুন্নত নয় মনে ক'রে পালন না করলে তার গোনাহ হবে না---তা নিয়ে নেবু কচলানোর মতো কচকচানি কোন পক্ষেরই উচিত নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আহলে হাদীস ফিক্বহ অস্বীকার করে না। ইজমা' ও কিয়াসও সময়ে পানি না পেলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার মতো ব্যবহার করে। মুফতী সাহেব তা নিজেও জানেন। তবুও তিনি বই-পড়ুয়া কোন কল্পিত আহলে হাদীসকে নিয়ে ছেলে-খেলা খেলেছেন। সত্যই বড় মজার খেলা!

কেবল বই পড়ে কেউ সব জিনিস উদ্ধার করতে পারে না, না মুক্বাল্লিদ, না কোন গায়র মুক্বাল্লিদ। যারা কোন হক্কানী আলেম-উলামার কাছে বসে বুঝে নেয় না, বরং সীমাবদ্ধ বুঝেই নিজের বুঝটাকে বড় মনে করে, তাদের সে বুঝ নিজেদের জন্য বোঝা স্বরূপ। আরবের উলামাগণ বলেন,

من كان كتابه شيخه، كان خطأه أكثر من صوابه.

অর্থাৎ, কিতাব যার ওস্তাদ হয়, ঠিকের থেকে তার বেঠিক (জ্ঞান) বেশী হয়।

কেউ যদি ডাক্তারি বই পড়ে সরাসরি রোগীর চিকিৎসা করে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে ভুল চিকিৎসা করাই স্বাভাবিক।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এক যুবক পত্রযোগে কেমিষ্ট্রির সার্টিফিকেট লাভ করেছিল এবং তাতে সে গর্বিত ছিল। একদিন তার টনসিল হলে নিজে নিজেই তার প্রেস্কিপশন লিখল। ফার্মেসিয়ান তা পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রোগী কুকুরের বয়স কত?'

সুতরাং দ্বীনী মাসায়েল কুরআন-হাদীসের পন্ডিত আলেমদের নিকট অবশ্যই বুঝে নিতে হয়। সরাসরি কিতাবী জ্ঞানের ভান্ডার নিয়ে কেউই সফল হতে পারে না।

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাআত

বিতর্কিত এ ব্যাপারে আহলে হাদীসের আমল নিম্নরূপ ঃ-

ইমাম সশব্দে ক্বিরাআত করলে মুক্তাদীকে ক্বিরাআত করতে হয় না। বিশেষ ক'রে সশব্দে কোন সূরা পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়। বরং ইমামের ক্বিরাআত চুপ করে শুনতে হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا)

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক। *(আ'রাফ ঃ ২০৪)*

সাহাবাগণ নামাযে সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন। একদা কোন জেহরী নামায থেকে সালাম ফিরে আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সাথে (সশব্দে) কুরআন পড়েছে?" এক ব্যক্তি বলল, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাতেই আমি ভাবছি যে, আমার ক্বিরাআতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে কেন।" আবূ হুরাইরা বলেন, 'এই কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর লোকেরা তাঁর সাথে জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।' *(মালেক, আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ৮৫৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যার ইমাম আছে, তার ইমামের ক্বিরাআত তার ক্বিরাআত।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৪৮৭নং)*

তিনি বলেন, "ইমাম তো এই জন্য বানানো হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। অতএব সে যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে, তখন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বল এবং যখন ক্বিরাআত করে তখন চুপ থাক।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ২৩৫৮-২৩৫৯নং)*

এ হল সাধারণ হুকুম। জেহরী নামাযে সশব্দে মুক্তাদী কোন ক্বিরাআত করতে পারবে না। আর 'ক্বিরাআত' মানে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরার ক্বিরাআত। তাই নিঃশব্দে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কারণ, সূরা ফাতিহার রয়েছে পৃথক বৈশিষ্ট্য।

মহানবী ﷺ বলেন,

"সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী)*

"সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।"

(দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)

"যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, মিশকাত ৮২৩নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' *(মুসলিম ৩৯৫, আবু দাউদ, তিমিযী, আবু আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

"উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা) এর মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিত ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(নাসাঈ, হাকেম, তিরমিযী, মিশকাত ২১৪২ নং)*

উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহ ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্য আম। তার দলীল নিম্নের হাদীস।

সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পশ্চাতে ফজরের নামায পড়ছিলাম। তিনি ক্বিরাআত পড়তে লাগলে তাঁকে ক্বিরাআত ভারী লাগল। সালাম ফিরার পর তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত কর।" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! (আমরা তো তা করি।) তিনি বললেন, "না, ক্বিরাআত করো না। অবশ্য সূরা ফাতিহা পড়ো। কারণ, যে তা পড়ে না তার নামায হয় না।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, হাকেম, মিশকাত ৮২৩নং)*

পক্ষান্তরে ইমাম জেহরী নামাযের শেষ এক বা দুই রাকআতে অথবা সিরী নামাযে নিঃশব্দে ক্বিরাআত করলে অথবা তাঁর ক্বিরাআত শুনতে না পাওয়া গেলেও মুক্তাদী সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বে এবং সেই সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারে। যেহেতু তা কুরআনের উক্ত আয়াত-বিরোধী নয়।

যে আবূ হুরাইরা বলেন, 'এই কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর লোকেরা তাঁর সাথে জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।' সেই (সূরা ফাতিহার গুরুত্ব নিয়ে হাদীস বর্ণনাকারী) আবূ হুরাইরাকে প্রশ্ন করা হল যে, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কীভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও

আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।’ *(মুসলিম ৩৯৫, আবু দাঊদ, তিরমিযী, আবু আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

এ ব্যাপারে আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন,

للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب.

অর্থাৎ, ইমামের দুটি চুপ থাকার জায়গা থাকে। সুতরাং তোমরা সেখানে সূরা ফাতিহা পড়ে নেওয়ার সুযোগরূপে ব্যবহার করো। *(জুয্উল ক্বিরাআহ, বুখারী ৩৩পৃঃ)*

অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ হতে।

كان مكحول يقول : اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا ، قال مكحول : اقرأ بها فيما جهر بها الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا ، وإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على حال، وروينا عن أبي سلمه بن عبد الرحمن أنه قال للإمام سكتتان فاغتنموهما.

অর্থাৎ, মাকহূল বলতেন, ‘মাগরিব, এশা ও ফজরের প্রত্যেক রাকআতে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পড়ে নাও।’ তিনি বলেন, ‘ইমাম সশব্দে পড়লে তুমি নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পড়, যখন সে ফাতিহা পড়ে চুপ হয়ে যাবে। যদি চুপ না হয়, তাহলে তার আগে, সাথে ও পরে পড়ে নাও। কোন অবস্থাতেই তা ত্যাগ করবে না।’ আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ‘ইমামের দুটি চুপ থাকার জায়গা থাকে। সুতরাং তোমরা সেখানে সূরা ফাতিহা পড়ে নেওয়ার সুযোগরূপে ব্যবহার করো।’ *(বাইহাক্বী ২/১৭১)*

মুফতী সাহেব (১১৬ পৃষ্ঠায়) যুক্তি পেশ ক’রে বলেছেন, ‘ইমামের পিছনে কেরাত (সূরা ফাতিহা পাঠ) করা সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে কেবল চারজন সাহাবী থেকে, আর কেরাত না করা সম্বন্ধে যত হাদীস এসেছে ১৬ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, এখন বলুন ৪ জনের হাদীস কে প্রাধান্য দেবেন না ১৬ জনের।’

সুধী পাঠক আপনি বলুন, আপনি সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেবেন, নাকি আপনার মযহাবের সমর্থক বলে যয়ীফ হাদীসকে প্রাধান্য দেবেন এবং

সহীহ হাদীসকে মনসূখ বলে উড়িয়ে দেবেন?

আপনি বলুন, যথাসাধ্য সকল সহীহ হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন ক’রে আমল করা কি উত্তম নয়?

মুফতী সাহেব যে ১৬ জন সাহাবীর ‘কেরাত’ না করার হাদীসের কথা বলেছেন, তার সবগুলি সহীহ নয়। সবগুলি হাদীস নয়, বরং আষার ও ফতোয়া। আর ‘কেরাত’ মানে আম ‘কেরাত’-এর হাদীস। সবগুলি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ নিষেধের হাদীস বা আষার নয়।

আর আহলে হাদীস যে সকল হাদীস পেশ করে, তা ৪ জন সাহাবীর নয়, বরং ১২ জন সাহাবীর। তারপর আষার ও ফতোয়া তো আছেই।

আসুন! আমরা মুফতী সাহেবের ৮ জন সাহাবীর হাদীস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

১। আবূ হুরাইরা ﷺ

একদা কোন জেহরী নামায থেকে সালাম ফিরে আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সাথে (সশব্দে) কুরআন পড়েছে?” এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, “তাতেই আমি ভাবছি যে, আমার ক্বিরাআতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে কেন।” আবূ হুরাইরা বলেন, এই কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর লোকেরা তাঁর সাথে জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল। *(মালেক, আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ৮৫৫নং)*

সুধী পাঠক! আহলে হাদীসের মতে ‘ক্বিরাআত করা থেকে বিরত’ হওয়ার অর্থ হল সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা। দলীল ঃ আবূ হুরাইরার অন্য বর্ণনা, ‘তুমি মনে মনে পড়ে নাও, ইমাম চুপ হলে পড়ে নাও।’

তাছাড়া লক্ষ্যণীয় যে, লোকেরা সির্রী নামাযে ক্বিরাআত থেকে বিরত হয়নি। অথচ মুফতী সাহেবরা সির্রী নামাযেও ক্বিরাআত থেকে বিরত থাকেন।

২। আলী ﷺ

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করে, সে প্রকৃতির বিরোধিতা করে। *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

প্রথমতঃ এটা হাদীস নয়, আষার। দ্বিতীয়তঃ এতে ক্বিরাআতের কথা আছে, সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ এর সনদ সহীহ নয়। মুখতার রাবীর কারণে আষারটি খুবই দুর্বল। হানাফী উলামা আল্লামা যায়লায়ী, ইবনু হুমাম ও লখনবী সাহেবও যয়ীফ বলেছেন। *(দীনুল হাক্ক ১/৩০৮)*

৩। জাবের বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রাকআত (নামায) পড়ল এবং তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, সে যেন নামাযই পড়ল না। তবে ইমামের পিছনে ছাড়া।" *(মুঅত্তা মুহাম্মাদ, ত্বাহাবী)*

এ হাদীস আহলে হাদীসের নিকট যয়ীফ। *(দেখুন ঃ ইরওয়াউল গালীল ৫০১, সিঃ যয়ীফাহ ৯৯২নং)*

৪। আবূ মূসা আশআরী رضي الله عنه

নবী ﷺ বলেছেন, "......ইমাম ক্বিরাআত করলে তোমরা চুপ থাকবে।" *(মুসলিম)*

'ক্বিরাআত করলে' অর্থ হল সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়লে। এর দলীল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে আবূ হুরাইরার হাদীসে। আর পরবর্তী আনাসের হাদীসেও রয়েছে সে দলীল।

৫। আনাস رضي الله عنه

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ নামায পড়ে সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা ইমামের ক্বিরাআত করা অবস্থায় ক্বিরাআত কর কি?" তাঁরা চুপ থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, 'আমরা তো পড়ি।' তিনি বললেন, "তোমরা তা করো না।" *(ত্বাহাবী)*

সুধী পাঠক! এ হাদীসটি অসম্পূর্ণরূপে ত্বাহাবীতে বর্ণিত হয়েছে। এর পরিপূরক পড়লে আপনার মনের আকাশে ঘনীভূত মেঘ কেটে যাবে।

عن أنس : أن رسول الله ﷺ صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال : (أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ) ؟ فسكتوا قالها ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون : إنا لنفعل قال : (فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه).

লক্ষ্য করুন, হাদীসটির শেষে রয়েছে, "তোমরা তা করো না। তবে তোমরা সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়ে নিয়ো।" *(আহমাদ ৫/৮১, ইবনে হিব্বান ৫/১৫২, ১৬২)*

৬। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ رضي الله عنه

নবী ﷺ বলেছেন, "যার ইমাম আছে, তার ক্বিরাআত ইমামের ক্বিরাআত।" *(মুঅত্তা মুহাম্মাদ)*

এ হাদীস বহু আহলে হাদীসের নিকট সহীহ নয়।

এ হাদীসেও 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল এতে নেই।

৭। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه

নবী ﷺ বলেছেন, "ইমামের ক্বিরাআত তোমার জন্য যথেষ্ট। চাহে সে সির্রী নামায পড়ুক অথবা জেহরী।" *(দারাক্বুত্বনী)*

আহলে হাদীসের নিকট এ হাদীস সহীহ নয়। দারাক্বুত্বনী নিজেও সে কথা বলেছেন। *(দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৫)*

তাছাড়া এ হাদীসেও 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল এতে নেই।

৮। উমার বিন খাত্ত্বাব رضي الله عنه

তিনি বলেছেন, 'যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করে, তার মুখে পাথর ভরে দেওয়া উচিত।' *(মুঅত্তা মুহাম্মাদ)*

এ আষারও আহলে হাদীসের নিকট সহীহ নয়। যেহেতু এর সনদ বিচ্ছিন্ন। *(দীনুল হাক্ব ১/৩০৮পৃঃ)*

তাছাড়া এ আষারেও 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল এতে নেই।

৯। যায়দ বিন সাবেত رضي الله عنه

তিনি বলেছেন, 'যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করে, তার নামায হয় না।' *(ইবনে আবী শাইবাহ)*

এ আষারও আহলে হাদীসের নিকট সহীহ নয়। *(সিঃ যয়ীফাহ ৯৯৩নং)*

তাছাড়া এ আষারেও 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল এতে নেই।

১০। সা'দ বিন আবী অক্কাস رضي الله عنه

তিনি বলেছেন, 'যে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করে, আমার ইচ্ছা হয় যে, তার মুখে আগুনের আঙ্গার ঢুকিয়ে দিই।' *(মুঅত্তা মুহাম্মাদ)*

এ আষারও আহলে হাদীসের নিকট সহীহ নয়। তাছাড়া কারো জন্য উক্ত কথা বলা জায়েযই নয়। যেহেতু আগুন আল্লাহর আযাব। তিনিই তা দিয়ে শাস্তি দেবেন। *(ইরওয়াউল গালীল ২/২৮০-২৮১)*

পরন্তু এ আষারেও 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল এতে নেই।

বাকী খুলাফায়ে রাশেদীনের ফতোয়া সহীহ হলেও তারও উদ্দেশ্য 'ক্বিরাআত' অর্থ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধের দলীল তাতেও নেই।

সুধী পাঠক! এ ব্যাপারে একজন সুবিজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ হানাফী আলেম আব্দুল হাই লখনবী সাহেবের সাক্ষ্য শুনুন। তিনি বলেছেন,

إنه لم يرد حديث مرفوع صحيح في النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، وكل ما ذكروه مرفوعاً فيه إما لا أصل له وإما لا يصح.

অর্থাৎ, ইমামের পশ্চাতে ফাতিহা পড়া নিষেধের ব্যাপারে কোন সহীহ মারফূ’ হাদীস আসেনি। এ ব্যাপারে ওঁরা যা কিছু মারফূ’ উল্লেখ করেছেন, হয় তার কোন ভিত্তি নেই অথবা তা সহীহ নয়।’ *(আত্-তা’লীকুল মাজীদ ৯৯পৃঃ)*

তিনি আরো বলেছেন,

الذي يظهر بالنظر الدقيق ويقبله أصحاب التحقيق هو أن الأحاديث التي استدل بها أصحابنا ليس فيها حديث يدل على النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام.

অর্থাৎ, (দলীলাদি উপস্থাপনের পর) সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণে যা প্রকাশ পায় এবং যা সত্যানুসন্ধানী মানুষ গ্রহণ করবেন, তা এই যে, যে সকল হাদীস দ্বারা আমাদের উলামাগণ দলীল পেশ করেছেন, তাতে একটা হাদীসও এমন নেই, যাতে ইমামের পশ্চাতে ফাতিহা পড়া নিষেধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। *(ইমামুল কালাম ২১২পৃঃ)*

এবারে মুফতী সাহেবের উল্লিখিত আহলে হাদীসের মাত্র ৪ জন সাহাবীর হাদীস সহ আরো হাদীস ও আষারের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করি, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা উল্লেখ আছে এবং যাতে পাঠকের কাছে হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১। আবূ হুরাইরা ﷺ

তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কীভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।’ *(মুসলিম ৩৯৫, আবু দাঊদ, তিরমিযী, আবু আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى

إلى أم القرآن فقد أجزأه.

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয নামায পড়ে, সে যেন তার চুপ থাকা অবস্থাসমূহে সূরা ফাতিহা পড়ে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে, তার জন্য তাই যথেষ্ট।” *(বাইহাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআহ ১/১৫২)*

عن أبي هريرة ، قال : إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها.....

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন, ‘ইমাম সূরা ফাতিহা পড়লে তুমিও পড়...।’ *(জুযউল ক্বিরাআহ, বুখারী ১/১৭৯)*

২। উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ

তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পশ্চাতে ফজরের নামায পড়ছিলাম। তিনি ক্বিরাআত পড়তে লাগলে তাঁকে ক্বিরাআত ভারী লাগল। সালাম ফিরার পর তিনি বললেন, “সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত কর।” আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! (আমরা তো তা করি।) তিনি বললেন, “না, ক্বিরাআত করো না। অবশ্য সূরা ফাতিহা পড়ো। কারণ, যে তা পড়ে না তার নামায হয় না।” *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, হাকেম, মিশকাত ৮২৩নং)*

عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام ».

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইমামের পিছনে যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না।” *(বাইহাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআহ ১/১২৮)*

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب.

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে, সে যেন সূরা ফাতিহা পড়ে।” *(মুসনাদুশ শামীয়ীন ১/১৭১, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৩২, আলবানীর নিকট হাদীসটি সহীহ নয়, তবে হাদীসটি পূর্বোক্ত সহীহ হাদীসের সমার্থবোধক।)*

তাই মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) বলেছেন,

هو فص الختام ونص الفاتحة خلف الإمام.

অর্থাৎ, এ হাদীসটি অঙ্গুরীর পাথর এবং ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার স্পষ্ট উক্তি। *(ফাসলুল খিত্বাব ১৪৭পৃঃ, দীনুল হাক্ব ১/২৬৪)*

৩। আনাস বিন মালেক ﷺ

তাঁর হাদীসে উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

তিনি নিজেও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। *(বাইহাক্বী ২/১৭০)*

৪। অজ্ঞাতনামা এক সাহাবী ﷺ

عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ ، قالوا : إنا لنفعل ذلك، قال : فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب.

একদা নবী ﷺ বললেন, “ইমামের ক্বিরাআত করা অবস্থায় তোমরাও হয়তো ক্বিরাআত কর?” সাহাবাগণ বললেন, ‘আমরা তো পড়ি।’ তিনি বললেন, “সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়ো না।” *(আহমাদ ৪/২৩৬, ৫/৬০, বাইহাক্বী, আঃ রায্‌যাক, ইবনে আবী শাইবাহ)*

৫। উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ

عن يزيد بن شريك : أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام، فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت : وإن كنت أنت؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن جهرت؟ قال : وإن جهرت.

ইয়াযীদ বিন শারীক বলেন, আমি উমারকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, ‘সূরা ফাতিহা পড়।’ আমি বললাম, ‘যদিও আপনি হন?’ তিনি বললেন, ‘যদিও আমি হই।’ আমি বললাম, ‘যদিও আপনি সশব্দে পড়েন?’ তিনি বললেন, ‘যদিও আমি সশব্দে পড়ি।’ *(দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী ২/১৬৭, হাকেম ১/২৩৯, ইবনে আবী শাইবাহ)*

৬। আলী বিন আবী ত্বালেব ﷺ

عن علي : أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب خلف الإمام.

আলী ﷺ আদেশ দিতেন অথবা পছন্দ করতেন যে, তিনি ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ আরো একটি সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়েন। *(দারাকুত্বনী ১/৩২২, হাকেম ১/২৩৯, বাইহাক্বী ২/১৬৮, ইবনে আবী শাইবাহ)*

৭। উবাই বিন কা’ব ﷺ

عن عبد الله بن أبي الهذيل : قال سألت أبي بن كعب أقرأ خلف

الإمام قال نعم.

আব্দুল্লাহ বিন আবী হুযাইল বলেন, আমি উবাই বিন কা’বকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আমি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করব কি?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ।’ *(বাইহাক্বী ২/১৬৮)*

৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ

عن عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال : صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر.

আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ আসাদী বলেন, ‘আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের পাশে ইমামের পিছনে নামায পড়লাম। আমি শুনলাম, তিনি যোহর ও আসরে ক্বিরাআত পড়ছেন।’ *(বাইহাক্বী ২/১৬০)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ في العصر خلف الامام في الركعتين بفاتحة الكتاب وبسورة.

অর্থাৎ, তিনি আসরে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পড়লেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৪০৯)*

১১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

عن أبي هريرة وعائشة : أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.

আবূ হুরাইরা ও আয়েশা যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের অন্য কিছু অংশ পড়তে আদেশ করতেন। আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। *(বাইহাক্বী ২/১৭১)*

১২। ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ

ইমাম বাইহাক্বী বলেছেন,

وروينا عن عمران بن حصين وروينا عن جماعه من التابعين.

(অনুরূপ ক্বিরাআত পড়ার ব্যাপারে) ইমরান বিন হুস্বাইন ও তাবেঈনের এক জামাআত থেকে আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। *(ঐ)*

১৩। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷛

عن مجاهد قال : سمعت عبد الله بن عمر وابن عتبة يقرءان خلف الإمام.

মুজাহিদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমার ও ইবনে উতবাকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তে শুনেছি। *(ঐ ২/১৬৯, আঃ রায্‌যাক)*

১৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷛

عن أبي نضرة قال : سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب.

আবূ নাযরাহ বলেন, আমি আবূ সাঈদকে ইমামের পিছনে ক্বিরাআতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'সূরা ফাতিহা পড়।' *(বাইহাক্বী ২/১৭০)*

১৫। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷛

عن جابر بن عبد الله قال : كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

তিনি বলেন, আমরা ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ আরো একটি সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তাম। *(বাইহাক্বী ২/১৭০)*

১৬। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷛

عن ابن عباس قال : لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب خلف (الإمام) جهر أو لم يجهر.

তিনি বলেন, 'ইমামের পিছনে সির্রী ও জেহরী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী।' *(আঃ রায্‌যাক ২/১৩০)*

عن ابن عباس قال : لا تدع أن تقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر.

তিনি বলেন, 'তুমি ইমামের পিছনে সির্রী ও জেহরী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে ছেড়ো না।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ১/৪১০)*

১৭। আবুদ দারদা ﷛

عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء قال : لا تترك قراءة فاتحة

الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر.

হাস্‌সান বিন আত্বিয়্যাহ বলেন, আবুদ দারদা বলেছেন, 'তুমি ইমামের পিছনে সির্রী ও জেহরী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে ছেড়ো না।' *(বাইহাক্বী ২/১৭০)*

১৮। হিশাম বিন আমের ﷛

عن حميد بن هلال ، أن هشام بن عامر قرأ ، فقيل له : أتقرأ خلف الإمام ؟ قال : « إنا لنفعل »

হুমাইদ বিন হিলাল বলেন, হিশাম বিন আমের ক্বিরাআত পড়লেন। তাঁকে বলা হল, 'আপনি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ছেন?' তিনি বললেন, 'আমরা তো পড়ি।' *(বাইহাক্বী ২/১৭০, ত্বাবারানী)*

১৯। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল ﷛

عن عبد الله بن مغفل ، أنه كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

তিনি ইমামের পিছনে যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ আরো একটি সূরা এবং শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। *(বাইহাক্বী ২/১৭১, জুযউল ক্বিরাআহ, বুখারী ১/৩৩)*

২০। আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷛

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهشام بن عامر ، أنهما كانا يقرآن خلف الإمام.

তিনি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করতেন। *(বাইহাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান অল-আষার ৩/১৪৫)*

এবার তাবেঈনদের বর্ণনায় সংক্ষেপে তাঁদের নাম উল্লেখ ক'রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে আহলে হাদীসের জিত দেখব।

১। সাঈদ বিন জুবাইর (রঃ)
২। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (রঃ)
৩। মাকহূল (রঃ)
৪। ইমাম হাসান বাসরী (রঃ)
৫। উরওয়াহ বিন যুবাইর (রঃ)
৬। ইমাম শা'বী (রঃ)
৭। ইমাম মুজাহিদ (রঃ)

৮। উবাইদুল্লাহ বিন উমার (রঃ)
৯। ইমাম ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ (রঃ)
১০। ইমাম আবুল মালীহ (রঃ)
১১। ইমাম যুহরী (রঃ)
১২। ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রঃ)
১৩। ইমাম হাকাম বিন উতবাহ (রঃ)
১৪। ইমাম আওযায়ী (রঃ)
১৫। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর উস্তাদ ইমাম আত্বা (রঃ)

আরও অনেকে রয়েছেন এই ক্বাফেলায়। *(দীনুল হাক্ব ১/২৭২-২৭৩)*

সুধী পাঠক! সুবিচার ক'রে বলুন, নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশের পর তাঁর সাহাবা এবং তাঁদের পরেও তাবেঈগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েছেন। সুতরাং সেই আমল কি ইমাম কারখীর নীতি অনুসারে সূরা আ'রাফের ২০৪নং আয়াত দ্বারা 'মনসূখ' মনে করা সত্যানুসন্ধানী মুসলিমদের কর্ম হতে পারে?

উক্ত আয়াতকে যদি নামাযে ক্বিরাআতের ব্যাপারে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলে সূরা ফাতিহা হবে ব্যতিক্রান্ত।

সুন্নাহতে প্রমাণিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সশব্দে দুআ ক'রে যেভাবে ঐ সূরার ৫৫নং (তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো) আয়াতকে অমান্য করা হয় না। ঠিক তেমনি সুন্নাহতে প্রমাণিত ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়লে ঐ আয়াতকে অমান্য করা হয় না, যেমন সূরা ফাতিহাকেও কুরআন ছাড়া অন্য কিছু বুঝা হয় না। আর আল্লাহই তাওফীক্বদাতা।

মুসাফাহাহ এক হাতে

মুসাফাহাহ এক হাতে এবং তার প্রমাণ রয়েছে একাধিক মরফূ' হাদীসে।

عن أنس بن مالك قال قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال: لا ، قال: أفيلتزمه ويقبله ؟ قال: لا ، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال: نعم. رواه الترمذي

আনাস ؓ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ নিজ ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার জন্য কি প্রণত হবে?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "না।" লোকটি বলল, 'তাহলে কি তাকে জড়িয়ে (ধরে মুআনাকা) করবে এবং চুম্বন করবে?' তিনি বললেন,

"না।" লোকটি বলল, 'তাহলে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" *(তিরমিযী ২৭২৮-নং)*

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ اليَمَانِ ؓ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ.

أخرجه الطبراني فى الأوسط (٨٤/١ ، رقم ٢٤٥)

হুযাইফা বিন য়্যামান ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন মু'মিন কোন মু'মিন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সালাম দেয় এবং তার হাত ধরে মুসাফাহাহ করে, তখনই তাদের পাপসমূহ ঝরে যায়, যেমন গাছের পাতা ঝরে যায়।" *(ত্বাবারানী ১/৮৪, ২৪৫নং)*

عن البراء قال قال رسول الله ﷺ : ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه و يأخذ بيده لا يأخذ بيده إلا لله فلا يفترقان حتى يغفر لهما.

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখনই কোন দুই মুসলিম ব্যক্তি আপোসে সাক্ষাৎ করে এবং একজন অপর সঙ্গীকে সালাম দিয়ে তার হাত ধরে---কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যের হাত ধরে---তখনই তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫৭৭৮-নং)*

عن أنس بن مالك قال : كان النبي ﷺ إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع...

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ-কে কোন মানুষ স্বাগতম জানাত এবং মুসাফাহা করত, তখন তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে নিজে ছাড়িয়ে নিত। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

এই হল আহলে হাদীসের দলীল, যার কারণে তারা এক হাতে মুসাফাহা করে। আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন,

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة : الأخذ باليد الواحدة فما يفعله بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة.

'সুতরাং এই সকল হাদীস এই কথারই দলীল যে, মুসাফাহায় সুন্নত হল এক হাত দিয়ে (সাথীর হাত) ধারণ করা। অতএব কিছু মাশায়েখের উভয় হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নতের খেলাপ।' *(সিঃ সহীহাহ ১/১৫)*

মুফতী সাহেব লিখেছেন, 'এদুন' শব্দ হল ইসমে জিন্স অর্থাৎ যে শব্দটি অল্প বা বেশি দুটোর উপরে বলা যেতে পারে।'

কিন্তু একটার জন্যেও তো ব্যবহার হয়। আরবরা দু'টো হাতের অর্থে 'য়্যাদাহু' বা 'য়্যাদাইহি' ব্যবহার করে।

'হাত' বলতে 'দুটি হাত' সব জায়গায় অর্থ গ্রহণ করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

{وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} (١٠٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। *(আ'রাফ ঃ ১০৮)*

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ} (٤٤) سورة ص

অর্থাৎ, আমি আইয়ুবকে আদেশ করলাম, 'তোমার হাতে ঘাস নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর, আর শপথ ভঙ্গ করো না।' *(স্বা-দ ঃ ৪৪)*

{إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} (٤٠) سورة النـور

অর্থাৎ, কেউ নিজ হাত বার করলে তা প্রায় দেখতেই পায় না। *(নূর ঃ ৪০)*

إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها.

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ কোন খানা খাবে, তখন সে যেন চেঁটে অথবা চাঁটিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত রুমালে তার হাত না মোছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.

অর্থাৎ, আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করুন; সে ডিম (অথবা হেলমেট) চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা যায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

অনুরূপ ক্ষেত্রে 'অল্প' বা একটি হাত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'ডান' হাত উদ্দেশ্য হবে।

শ্রেষ্ঠ মুসলিম সে, "যার হাত ও জিভ হতে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।" *(বুখারী ১১ নং, মুসলিম ৪২ নং)*

এখানে 'য়্যাদ' (হাত) মানে দু'টি বা একটি হাত নয়। এখানে উদ্দেশ্য

'উমূম'। অর্থাৎ, আম হাত, চাহে তা ডান হাত হোক বা বাম হাত হোক। মুসাফাহার হাদীসে ডান হাত না মানলেও বলতে হবে, শব্দে ব্যাপকতা আছে। আর সেই ব্যাপকতা নির্দিষ্ট করা যায় অন্য হাদীস দিয়ে।

অন্য হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ ভাল কিছু ধরতে ডান হাত ব্যবহার করতেন এবং খারাপ জিনিস ধরতে বাম হাত ব্যবহার করতেন। *(আবূ দাঊদ প্রমুখ)*

عن عبد الله بن بسر قال: ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله.....

আব্দুল্লাহ বিন বুস্র বলেছেন, 'তোমরা আমার এই করতল দেখছ, এর দ্বারা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে মুসাফাহাহ করেছি....।' *(তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার্র ১২/২৪৭)*

নিশ্চয় তাঁর সে করতল ডান হাতের।

عن أنس بن مالك قال: صافحت بكفي هذا كف رسول الله ﷺ فما مسست خزاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله ﷺ.

আনাস বিন মালেক বলেন, আমি আমার এই করতল দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল স্পর্শ ক'রে মুসাফাহাহ করেছি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা বেশি নরম কোন রেশমবস্ত্র আমি স্পর্শ করিনি। *(আল-উজালাহ ফিল আহাদীসিল মুসালসালাহ ১/১২)*

আরবের আভিধানিকরা মুসাফাহাহ মানে এক হাত দিয়েই মুসাফাহাহ বুঝেন। তাঁরা বলেছেন,

المصافحة وهي وضع أحد المتلاقين يده على باطن كف الآخر إلى الفراغ من السلام.

অর্থাৎ, মুসাফাহাহ হল ঃ সালাম শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই সাক্ষাৎকারীর একজনের হাতকে অপরের করতলের মাঝে রাখা। *(আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী ২/৩২৫)*

الرجل يصافح الرجل : إذا وضع صفح كفه في صفح كفه.

লোক লোকের সাথে মুসাফাহাহ করে, যখন সে তার করতলকে ওর করতলে স্থাপন করে। *(লিসানুল আরাব)*

যদি মুসাফাহাহ দুই হাতে হয়, তাহলে উক্ত অর্থে মুসাফাহাহ হয় না। যেহেতু করতলকে করতলে রাখতে হলে বাম হাতের করতল সঙ্গীর করতলে রাখা সম্ভব হয় না। পরন্তু করতলকে করতলে রাখতে হলে ডান

হাত দিয়ে সঙ্গীর ডান হাত এবং বাম হাত দিয়ে বাম হাত ধরতে হবে, তবেই মুসাফাহাহ সার্থক হবে। আর এমন কাঁইচি মার্কা মুসাফাহাহ ডবল মুসাফাহার শামিল হবে, যা সুন্নত নয়।

বলা বাহুল্য, সালাম অথবা বায়আতের সময় মুসাফাহাহ উভয় পক্ষের কেবল ডান হাত দ্বারাই সুন্নত।

عن عمرو بن العاص قال أتيت النبي فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله الحديث.

ورواه أبو عوانة في صحيحه وفيه فقلت: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، فبسط يمينه....

আম্র ইবনে আ'স ﵁ বলেন, ...যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্র! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কী?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং হজ্জ্বও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?" *(মুসলিম)*

আবূ আওয়ানার বর্ণনায় আছে, আম্র বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' সুতরাং তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন।'

قال وهب بن منبه : هو يمين البيت، أما رأيت الرجل إذا لاقى أخاه صافحه بيمينه.

অহাব বিন মুনাব্বিহ (তাবেয়ী) বলেন, '(হাজরে আসওয়াদ) ঘরের ডান হাত। তুমি কি লোককে দেখনি, যখন সে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন নিজ ডান হাত দিয়ে মুসাফাহাহ করে?' *(আঃ রায্যাক ৫/৩৯)*

এ ব্যাপারে অনেক হানাফী উলামাও একমত প্রকাশ করেছেন। যেমন

ইবনুল আবেদীন (রঃ) বলেছেন, 'মুসাফাহাহ ডান হাত দ্বারা।' *(রদ্দুল মুহতার)*

শায়খ যিয়াউদ্দীন হানাফী নক্সবন্দীও বলেছেন,

والظاهر من آداب الشريعة تعين اليمنى من الجانبين لحصول السنة...

অর্থাৎ, শরীয়তের আদবের স্পষ্ট দিক এই যে, উভয় পক্ষের ডান হাত নির্ধারিত। যেহেতু তাতে সুন্নত পালন হবে। *(লাওয়ামিউল উকূল)*

ইমাম নাওয়াবী বলেন,

يستحب أن تكون المصافحة باليمنى وهو أفضل.

অর্থাৎ, মুস্তাহাব এই যে, মুসাফাহাহ ডান হাত দ্বারা হবে, এটাই আফযল। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০)*

মুনাবী শাফেয়ী বলেছেন,

ولا تحصل السنة إلا بوضع اليمنى في اليمنى حيث لا عذر.

অর্থাৎ, বিনা ওজরে ডান হাতের মাঝে ডান হাত না রাখলে সুন্নত পালন হবে না। *(আর-রাওযুন নাযীর)*

আব্দুল ক্বাদির জীলানী (রঃ) বলেছেন,

فصل فيما يستحب فعله بيمينه وما يستحب فعله بشماله يستحب له تناول الأشياء بيمينه والأكل والشرب والمصافحة والبداءة بها في الوضوء والانتعال ولبس الثياب الخ..

অর্থাৎ, পরিচ্ছেদ ঃ যে কাজ ডান হাত দিয়ে করা মুস্তাহাব এবং যে কাজ বাম হাত দ্বারা করা মুস্তাহাব। পানাহার, মুসাফাহাহ, ওযূ শুরু, জুতা ও কাপড় পরা শুরু ইত্যাদি ডান হাত দ্বারা করা মুস্তাহাব। *(গুন্য়াতুত ত্বালেবীন, দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪২৯-৪৩০)*

মুফতী সাহেবরা যেরূপ 'হেদায়াহ' মানেন, আহলে হাদীসরাও সেই রূপই বুখারী মানে---এটা তাঁর স্বকপোলকল্পিত ধারণা মাত্র। তাই বুখারী শরীফে দলীল পেয়ে বড় আস্ফালনের সাথে তাঁর কল্পিত আহলে হাদীসকে নাজেহাল করেছেন। তিনি দুই হাতের মুসাফাহাহ করার একটি হাদীসও পেশ করেননি। ভেবেছেন, বুখারী শরীফ বললেই আহলে হাদীসের জোঁকের মুখে নুন পড়ে যাবে এবং সহজেই বাজিমাৎ হয়ে যাবে! অথচ ইবনে মাসউদের উক্ত বর্ণনায় মুসাফাহার কোন দলীলই নেই। মুসাফাহার পদ্ধতির ব্যাপারে ইমাম বুখারীর শর্তে কোন হাদীস না থাকায় তিনি ঐ

হাদীস পেশ করেছেন।

উলামাগণ বলেন,

وأما قول بن مسعود ﵁ : علمني النبي ﷺ وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، أخرجه الشيخان فليس من المصافحة في شيء بل هو من باب الأخذ باليد عند التعليم لمزيد الاعتناء والاهتمام به.

অর্থাৎ, ইবনে মাসঊদ ﵁-এর এই উক্তি, 'নবী ﷺ আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, যেমন আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। আর আমার করতল তাঁর দুই করতলের মাঝে ছিল।' *(বুখারী-মুসলিম)* এ উক্তি মুসাফাহার ব্যাপারে মোটেই নয়। বরং তা হল অধিক যত্ন ও আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষাদানের সময় (ছাত্রের) হাত ধরার পর্যায়ভুক্ত।

একই কথা বলেছেন লখনবী সাহেব এবং আরো অনেক হানাফী উলামাও। *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩২-৪৩৩)*

অসিয়ত, শিক্ষা ও তা'লীম দানের সময় এই শ্রেণীর হাত ধরা অন্য হাদীস দ্বারাও বুঝা যায়। যেমন ঃ-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّكَ». فَقَالَ «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

মুআয ﵁ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুআয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে এ শব্দগুলি বলতে ছাড়বে না, 'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুস্‌নি ইবা-দাতিক।" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) *(আবূ দাউদ, নাসায়ী)*

عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا كان يكثران السفر نحو هذا البيت قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ رسول الله بيدي فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى الحديث.

আবূ কাতাদাহ ও আবুদ দাহমা এই ঘরের বেশি বেশি সফর করতেন। তাঁরা বলেন, আমরা এক বেদুঈন ব্যক্তির কাছে এলাম। বেদুঈন বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমার হাত ধরে তার কিছু শিখাতে লাগলেন, যা আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাঁকে শিখিয়েছেন.....। *(আহমাদ)*

عن شكل بن حميد قال أتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله علمني تعوذاً أتعوذ به قال فأخذ بكفي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي الحديث.

শাকাল বিন হুমাইদ ﵁ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি আশ্রয় প্রার্থনার দুআ শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করব। সুতরাং তিনি আমার করতল (বা হাত) ধরে বললেন, "বল, আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি সাময়ী...।" *(নাসাঈ, হাকেম আবূ য়্যা'লা প্রমুখ)*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس الحديث.

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "কে আমার নিকট থেকে এই বাক্যগুলি গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করবে অথবা তাকে শিক্ষা দেবে, যে সেই অনুযায়ী আমল করবে?" আমি বললাম, 'আমি হে আল্লাহর রসূল!' সুতরাং তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে পাঁচটি কথা বললেন, "হারাম থেকে দূরে থাক, তুমিই হবে সবচেয়ে বড় আবেদ.....।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

ইমাম বুখারী (রঃ) বাব বেঁধেছেন মুসাফাহার নামে। তাতে আপনাদেরই বা নাচানাচির কী আছে? তিনি কি কোন মুসাফাহার হাদীস উল্লেখ করেছেন? তিনি তাঁর শর্তে মুসাফাহার কোন সহীহ হাদীস পাননি বলেই তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় হাত ধরার ঐ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর সেটাই আপনাদের বড় দলীল হয়ে গেল? তাহলে মুসাফাহার ব্যাপারে বাকী সহীহ হাদীসগুলির দোষ কী? মনসূখ অথবা তা'বীল?

এ ব্যাপারে বুখারীকে কেন এত উচ্চ স্থান? নিজেদের মযহাব মতো বলেই তো? তাহলে আপনাদেরও তো সেই 'মিঠা মিঠা হাফ হাফ, কড়োয়া কড়োয়া থুঃ থুঃ।' তাই নয় কি সাহেব?

মুফতী সাহেব (১৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'ইহার দ্বারা কেমন ভাবে বুঝে

আসে যে, সাহাবী কেবল একটি হাত দিয়ে ছিলেন। সাহাবা কেরাম গণ তো হুজুরের ইঙ্গিতে জান দেওয়ার জন্য তৈরী। তাঁহাদের থেকে কেমন ভাবে আশা করা যেতে পারে যে, হুজুর দুহাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করছেন আর সাহাবী কেবল এক হাত বাড়াচ্ছেন। ইহা কোনদিন সম্ভব নয়।'

সুধী পাঠক! আপনি নিজে বুখারীর হাদীস পড়ে নিজেই ফায়সালা করুন যে, মুফতী সাহেবের ঐ বুঝ সঠিক কি না? হাদীসে কি আছে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ানোর কথা?

তারপর সাহেব লিখেছেন, 'এখানে আল্লাহর রসূলের অনুসরণ কে ছেড়ে সাহাবীর অনুসরণ করেছেন কেন? সাহাবীর আমল কে প্রমাণ যোগ্য মানছেন কেন?'

মুফতী সাহেব! এত বড় বে-ইনসাফ হওয়া ঠিক নয়? আহলে হাদীসরা কি বুখারীর ঐ হাদীস মেনেই এক হাতে মুসাফাহাহ করে? এক হাতে মুসাফাহাহ করার খাস দলীল কি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় না? কেন আপনি আহলে হাদীসকে অপবাদ দিয়ে লিখেছেন, 'আপনারা কি মন চাহি জীবন চান। আপনারা কি চান শরীয়াত আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হোক। আপনারা কি চান শারিয়াত আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা শরিয়াতের অনুসারী নন!!!!!'

আপনি কি আহলে হাদীসদেরকে তাই মনে করেন? বিল্লাহি এর জবাব দেবেন সমাজকে এবং কাল কিয়ামত কোর্টে। নিশ্চয় আহলে হাদীসের নিকট শরীয়ত আপনার একই স্তবকে লিখিত 'শরীয়াত-শারিয়াত ও শরিয়াত'-এর মতো নয়। ইচ্ছামতো শরীয়ত বানানোর অধিকার কারো নেই। বরং মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠)

سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(ক্বাস্বাস ঃ ৫০)*

সুতরাং যারা সহীহ হাদীস জানার পরেও তা মানতে মাথা চুলকায় আসলে তারাই নিজেদের ইচ্ছা-পূজারী। আহলে হাদীস সহীহ হাদীস তথা

রসূল ﷺ-এর হাদীস পাওয়ার পর নিজেদের অথবা অন্য কারো ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে পারে না জনাব! আহলে হাদীসের নীতি হল,

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥١) سورة النـور

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। *(নূর ঃ ৫১)*

তাদের নীতি তা নয়, যা আপনি তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ ক'রে (১৩৮ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, 'এরি নাম গয়ের মুকাল্লিদ বুঝে ও বুঝব না জেনে ও মানব না।'

বরং এ নীতি অনেকটা মুক্বাল্লিদদেরই, 'আমাদের মযহাবের খেলাপ যত কুরআনের আয়াত ও হাদীস আছে সব মনসূখ, নতুবা তাবীলযোগ্য!!!'

মুফতী সাহেব আদব ও হায়া-শরমের বেড়া ডিঙিয়ে (১৩৭ পৃষ্ঠায়) বুঝাতে চেয়েছেন, আহলে হাদীসরা মুসাফাহার ব্যাপারে ইংরেজ তথা ভারতীয় সেনার অনুকরণ করে।

কিন্তু সহীহ হাদীস মানতে গিয়ে যদি কারোর সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়, তাতে আহলে হাদীসের দোষ কী?

এখন মুশরিকরা দাড়ি রাখছে, ইয়াহুদী ও শিখরা দাড়ি রাখে। তাহলে হাদীস মেনে দাড়ি রাখলে কি তাদের আনুরূপ্য হচ্ছে বলা যাবে? শিখরা পাগড়ী পরে, কেউ যদি সুন্নত পালন ক'রে পাগড়ী পরে, তাহলে কি তাতে তাদের সাদৃশ্য হচ্ছে বলা যাবে? কোন আলেম তো তা বলতে পারেন না।

অমুসলিমরা করে করমর্দন। 'মুসাফাহাহ' মানে করমর্দন নয়। করমর্দন হল, দুইজনের প্রীতিসম্ভাষণার্থ পরস্পরের হাতঝাঁকুনি, যাকে ইংরেজীতে 'হ্যান্ডশেইক' বলা হয়। আর ইসলামী মুসাফাহাতে হাতের ঝাঁকুনি নেই, মর্দন, দলন বা পেষণ নেই। বরং তাতে আছে করতলের সাথে করতলের মিলন। আরবে এক হাতে মুসাফাহাহর প্রচলন আছে বলেই সঊদী আরবের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ বকর আবূ যায়দ (রঃ) দু-হাতে মুসাফাহাকে আজমদের অভ্যাস বলে অভিহিত করেছেন এবং তাতে আজমদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। *(হিলয়াতু ত্বালিবিল ইল্‌ম ১৮পৃঃ)* আর রসূল ﷺও আমাদেরকে আজমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাঊদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং)*

সুধী পাঠক! মুসাফাহাহ একটি ছোট্ট বিষয়। তাতে আপনি কার অনুকরণ করবেন, তা নিজেই ঠিক ক'রে নিন। কারা আপনাকে ভুল বুঝায়, সেটাও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার ক'রে নিন। আর পারলে লক্ষ টাকার পুরস্কারটা আপনিই আদায় ক'রে নিন। তবে নোটগুলি দেখে নেবেন কিন্তু!

বুখারীর ছাড়া অন্য হাদীস

মুফতী সাহেব ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'গর্বের সঙ্গে নামাযে দাঁড়ানো' (বুখারীতে নেই)।

গর্বের সঙ্গে নামাযে দাঁড়ানো কি আহলে হাদীসের দ্বীনী আমল, নাকি কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব আমল?

গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায বুখারীতে নেই।

মনে মনে বিদ্বেষ রেখে নামায বুখারীতে নেই।

মনে মনে কুচিন্তা করে নামায বুখারীতে নেই।

সুধী পাঠক! এই শ্রেণীর কোন আমলের বুখারী বা কোন হাদীসের সাথে কী সাথ? মুফতী সাহেব কেন বুঝেননি সে কথা? নিস্ফল তর্কে কেন নিজের তথা পাঠকের সময় ব্যয় করেছেন?

তাছাড়া কে বলেছে তাঁকে যে, আহলে হাদীস বুখারী ছাড়া অন্য হাদীস মানে না? আসলে আহলে হাদীস তো বুখারীর অনেক কথাই মানে না। যেহেতু তারা কোন ইমাম ও আলেমেরই অন্ধানুকরণ করে না। সুতরাং কথার তত্ত্ব না জেনেই তার তথ্য-সন্ধানে এত খড়-কুটা পোড়ানোর মানে কী?

তিনি লিখেছেন, 'আপনাদের ঝাণ্ডায় তলোয়ারের ছবি রেখেছেন এবং কলেমা লিখে রেখেছেন এ দুটো জিনিস বুখারী তো দুরের কথা হাদীসের কোনো কেতাবে নেই - যে হুজুরের ঝাণ্ডায় তলোয়ারও ছিল এবং কলেমাও ছিল এটা তো একদম বেদয়াৎ। অন্যান্য লোক যদি উচ্ছ স্বরে কলেমা পড়ে নামাযের পরে তাহলে সে হবে বেদায়াতি। আর আপনারা একটি নতুন ঝাণ্ডা মন গড়া ভাবে তৈরী করেছেন তো আপনারা কি বেদায়াতি নয়?'

পাঠক বুঝেছেন কি না জানি না। আহলে হাদীসের কি কোন ঝাণ্ডা আছে? নাকি সঊদী আরবের ঝাণ্ডার কথা বলছেন কে জানে?

প্রত্যেক দেশের জাতীয়-পতাকা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পতাকার রঙ-ঢঙ ইত্যাদি নিছক পছন্দের ব্যাপার। আমার মনে হয়, এটা নিছক দুনিয়াবী ব্যাপার। এর মাধ্যমে কোন মুসলিম সওয়াবের উদ্দেশ্য রাখে না

অথবা এই শ্রেণীর পতাকা তৈরি ক'রে দ্বীন পালন করে না। তাহলে সেটা বিদআত হয় কীভাবে?

খাওয়া-পরা ইত্যাদিতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পছন্দ আছে। ভারতের সকল মুসলমানদের লেবাস এক নয়। আরবেরও এক নয়। সঊদী আরবের লেবাস লম্বা জামা, মাথায় সাদা অথবা লাল রুমাল ঘোমটার মতো রাখতে হয়। মুফতী সাহেবের ফতোয়ায় এটাও কি বিদআত হবে তাহলে?

পতাকার সাথে যিক্‌রের কি তুলনা হয়? যিক্‌র তো সওয়াবের উদ্দেশ্যেই করা হয়। ঐরূপ ঝাণ্ডাও কি তাই? যদি কেউ সেই মনে ক'রে ক'রে থাকে, তাহলে বিদআত বলতে পারেন। কিন্তু সবুজের উপরে সাদা রঙের এমন আঁকা ও লেখা যদি নিছক দুনিয়াদারী ও রাজনৈতিক ব্যাপার হয়, তাহলেও কি তাকে 'দেখতে লারি চলন বাঁকা'র নজরে বিদআত বলবেন? অথচ নবী ﷺ বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমার এই (দ্বীনে নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন (কথা বা আমল) উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর হাদীসের সমস্ত কিতাব কি আপনি পড়ে ফেলেছেন? তাই দাবী করেছেন, 'হাদীসের কোনো কেতাবে নাই'! ত্বাবারানীর আল-মু'জামুল আওসাত্ব (১/৭৭) খুলে দেখুন,

عن بن عباس قال : كانت راية رسول الله سوداء ولواؤه أبيض مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله...

খালি মাথায় নামায

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কিছু কাজ আছে, যা করা আমাদের জন্য সুন্নত। আর কিছু কাজ আছে, যা তিনি কাজের বৈধতা বয়ানের জন্য করেছেন, যা আমাদের করা সুন্নত নয়। প্রয়োজন বা সময়-ক্ষেত্রে সেই কাজ করলে কোন পাপ হয় না। যেমন দাঁড়িয়ে পানি পান করা, দাঁড়িয়ে পেশাব করা, এক কাপড়ে নামায পড়া ইত্যাদি।

যদি কেউ অনুরূপ কাজকে সুন্নত মনে করে, তাহলে সে ভুল করে।

যদি কেউ মনে করে, একটি কাপড়ে নামায পড়া সুন্নত, তাহলে সে ভুল করে। কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে, একটি কাপড়ে নামায পড়া মানে,

কেবল পাগড়ী পরে, অথবা কেবল মোজা পরে, অথবা কেবল গেঞ্জি পরে, অথবা (মেয়েদের) কেবল সায়া বা ব্লাউজ পরে নামায সুন্নত অথবা নামায হয়ে যাবে। (অথচ মেয়েদের লেবাসের বিধান পুরুষদের থেকে ভিন্ন।) তাহলে তাকে 'বদ্ধ পাগল' বলা যাবে।

পক্ষান্তরে যারা পাগল বা নির্বোধ শিশু নয়, তারা ঠিকই বোঝে যে, একটি কাপড় দেহে দিলে কোন্ জায়গাটায় তা দেওয়া জরুরী। মুফতী সাহেবের (১৪১ পৃষ্ঠার) সংলাপটির ব্যাপারে রুচিশীল পাঠকই বিচার করবেন, তা আসলে সংলাপ না প্রলাপ?

মুফতী সাহেব আহলে হাদীসের নীতি বুঝেন না অথবা জানেন না বলে, খামোখা তা নিয়ে নেবু কচলে তেঁতো করেছেন। তিনি (১৪২ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'সত্যই ভাই যখন আপনারা কোনো জিনিসকে মানতে না চান, তখন সুদ্ধ মরফু হাদীসকেও অস্বীকার করে বসেন। কেননা ওটা আপনাদের মসলাকের বিপরীত। আর যখন আপনাদের নীতির উপযোগি হয়। যদিও সেটা তাবেয়ি অথবা তাবেয় তাবেইনের কথা বা কাজ হোক না কেন সেটা মানাবার জন্য লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।'

অথচ এ নীতি কোন আহলে হাদীসের হতেই পারে না। আহলে হাদীসের কোন 'মসলাক' নেই, যেমন মযহাবীদের 'মযহাব' আছে। সহীহ হাদীসকে প্রতিষ্ঠা করা যাদের কাজ, তারা তা অস্বীকার করবে কোন্ সাহসে? এটি এমন একটি অপবাদ, যার প্রবাদ আছে আরবীতে,

رمتني بدائها وانسلت.

মুফতী সাহেবের গালে কালি দেখানোর প্রতিশোধে তিনি আহলে হাদীসের চোখের সুর্মাকেও কালি বলে চিহ্নিত ক'রে অপমান করেছেন। শুদ্ধ হাদীসকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে 'মনসূখ' বললে অস্বীকার হয় না, গা বাঁচানো যায় আর কি?

পক্ষান্তরে আহলে হাদীস কোন সাহাবী অথবা তাবেয়ীর আমলকে তখনই নিজেদের আদর্শ মনে করে, যখন মহানবী ﷺ-এর আদর্শ তাদের সামনে থাকে না। আর তাতে তো কারো নিকট কোন দোষ নেই। আর এ জন্যই ইমাম আবু দাউদ (শরীফের নয়) শারীকের ঐ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

মুফতী সাহেব খালি মাথায় নামায পড়ার ব্যাপারে আহলে হাদীসের ফতোয়া জেনেও জাহেলের সাথে বৃথা তর্ক করেছেন। তিনি অবশ্যই এ হাদীস পড়েছেন,

(من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء.....)

সুতরাং তাঁর এই শ্রেণীর কাষ্ঠ-তর্ক থেকে দূরে থাকা কর্তব্য ছিল। তবুও একজনকে লাঞ্ছিত ক'রে কিছু বলা ও লেখার সাথে একটি জামাআতকে অপমানিত ক'রে তৃপ্তি তিনি অনায়াসে অনুভব করেছেন, যা কোন আলেমের নিকট থেকে বাঞ্ছনীয় নয়।

মুফতী সাহেব নির্দিষ্ট লেবাস-পোশাককে জরুরী সুন্নত বলে মনে করেছেন এবং নামাযে মাথা ঢাকা জরুরী ভেবেছেন। তাই তো অনেক জায়গায় দেখা যায়, তালপাতা দিয়ে বোনা ডালি অথবা প্লাস্টিকের টুপি অথবা গা-মোছা গামছা অথবা পোঁটা মোছা রুমাল দিয়েও মাথা ঢেকেই নামায পড়ে। মসজিদে রাখা সেই সব টুপি থেকে তেল-চিটার বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হয়, তা-ও মাথায় চাপিয়ে নামায পড়ে! জরুরী ভেবেই তো। অথচ সুন্নতকে জরুরী জ্ঞান করা নিশ্চয় ঠিক নয়।

তাছাড়া আমরা পারি না সাহেব সেই সকল লেবাস-পোশাক পরতে, যা আল্লাহর নবী ﷺ পরেছেন। সেই টুপি-পাগড়ী, সেই ইযার ও রিদা পরি কি আমরা? দেশ ও পরিবেশ গুণে বেশের পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য যা শরীয়ত-বিরোধী তা নিশ্চয়ই বর্জন করতে হবে।

মুফতী সাহেব (১৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'যদি অলসতা বা অবহেলা করে মাথা না ঢেকে নামাজ পড়ে। তাহলে ইয়াহুদিদের সাথে মুসাবাহাত বা অনুরূপ সাব্যস্ত হবে।'

অন্য জায়গায় লিখেছেন, 'আপনি নিশ্চিত খৃষ্টানদের কে এবাদত করতে দেখেছেন সবাই খালি মাথায় নামায পড়ে।'

কিন্তু সাহেব! ইয়াহুদীরা তো মাথায় টুপি রেখেই নামায পড়ে, তাওরাত পড়ে, বরং তাদের ধর্মপ্রাণ মানুষরা সর্বদা টুপি লাগিয়েই থাকে। আপনার কাছে ইন্টারনেট থাকলে দেখে নিতে পারেন তাদের নামায। তাহলে মাথায় টুপি লাগিয়ে নামায পড়লেই কি তাদের আনুরূপ্য হচ্ছে না? তাছাড়া তারা নামাযে রুকূ-সিজদা করে, তাতে কি তাদের 'মুশাবাহাত' হয় না?

মাথায় পাগড়ী বেঁধে নামায পড়লে শিখদের 'মুশাবাহাত' (সাদৃশ্য) হয়, আরবের খ্রিষ্টানরাও মাথায় পাগড়ী বাঁধে, তাহলে আপনি কী করবেন?

আমি অবশ্য বলছি না যে, এ সবে তাদের 'মুশাবাহাত' হয়। আমি বলছি, যারা খালি মাথায় নামায পড়ে, তাদেরকে এত বড় শাস্তি দেবেন না। কারণ এমন মসলায় ঝালটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আবার ইয়াহুদীদের অবহেলার সাথে টুপি না নিয়ে নামায পড়ার প্রমাণে কুরআনের একটি আয়াত পেশ করেছেন এবং (১৪৩ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, 'কুরান শরীফের মধ্যে ইহুদীদের সম্বন্ধে আল্লাহর বাণী আছে,

{وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى}

অর্থাৎ, তাহারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তো অলসতার সহিত দাঁড়ায়।'

প্রিয় পাঠক! আপনার কী মনে হয়? অলসতার সহিত দাঁড়ানোর একটা মানে কি এই যে, তারা মাথায় টুপি না দিয়ে দাঁড়ায়?

'তাহারা' বলতে কাহারা? ইয়াহুদীরা? সুধী পাঠক পূর্ণ আয়াতটি পড়ে নিজেই বিচার করুন, 'তাহারা' কাহারা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢)

سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। *(নিসাঃ ১৪২)*

আল্লাহর নামে এই শ্রেণীর মারাত্মক ভুল মুফতী সাহেবদের নিকট থেকে বাঞ্ছনীয় নয়।

যদি বলেন, 'তাহলে মুনাফিকদের মুশাবাহাত হয়।' তাহলে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, মুনাফিকরা খালি মাথায় নামায পড়ত।

সে যাই হোক, উলামায়ে আহলে হাদীসদের ফতোয়া মুফতী সাহেব জেনেও একজন জাহেলের সামনে অসাধ্য শর্ত লাগিয়ে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। হয়তো বা তা শুধু 'টিট ফর টাট'-এর নীতিতে। তাছাড়া মসলায় যখন প্রায় একমত, তখন এতগুলো পাতা খরচ করার কী অর্থ হয়? অবশ্য সুদীর্ঘ সংলাপের পর একজন জাহেল এ কথা বুঝতে পেরেছে যে, খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নত নয়, বরং মাকরূহ। তবে এ কথাও জেনে রাখা ভাল যে, 'খুশূ-খুযূ' (বিনয়-নম্রতা) প্রকাশের জন্য ইচ্ছা ক'রে খালি মাথায় নামায পড়া বিদআত। যেহেতু তারও কোন প্রমাণ নেই। *(তামামুল মিন্নাহ ১/১৬৪পৃঃ)*

নামাযে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়ানো

এই শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে মুফতী সাহেব (১৫১ পৃষ্ঠায়) বদ-আমল আহলে হাদীসের কিছু আমল নোট করেছেন। যেমনঃ-

বাহু শক্ত ক'রে দাঁড়ানো

আহলে হাদীসের আমল হল, বাহু নরম ক'রে দাঁড়ানো।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

خياركم ألينكم مناكب في الصلاة.

"তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুমূলসমূহকে (পাশের নামাযীর জন্য) নরম রাখে।" *(আবূ দাঊদ ৬৭২নং)*

সুতরাং যে বাহু শক্ত ক'রে দাঁড়ায়, সে ভাল লোক নয়।

ঘাড় উঁচু ক'রে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো

এমন দাঁড়ানো অহংকারীর নিদর্শন। বলা বাহুল্য, নামাযে বিনয়-নম্রতার সাথে দাঁড়ানো আহলে হাদীসের কাজ। ঘাড় উঁচু ক'রে না দাঁড়িয়ে সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। আর তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় তর্জনী আঙ্গুলের দিকে।

বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ানো

মুফতী সাহেবরা এটিকে অহংকারের চিহ্ন হিসাবে মনে করেন। যেহেতু তাঁরা মনে করেন, নাভির নিচে হাত রেখে দাঁড়ালে বিনয়ী দেখায়। আর এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

মাথা না ঢেকে দাঁড়ানো

মুফতী সাহেবের নিকট কোনভাবে মাথা ঢাকলেই হয়। আহলে হাদীসের নিকট মাথায় পাগড়ী অথবা টুপি দিয়ে দাঁড়াতে হয়, যাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা উচিত নয়, যাতে সৌন্দর্যের স্থলে অসৌন্দর্য আসে।

পা দু'টি ফাঁক ক'রে দাঁড়ানো

কাতারে পা দু'টির মাঝে এমন ফাঁক ক'রে দাঁড়ানো উচিত নয়, যাতে বাহুমূলের সাথে বাহুমূল দূরে থাকে। বরং এমনভাবে দাঁড়াতে হবে, যাতে পায়ে পা লাগে এবং বাহুমূলের সাথে বাহুমূলও।

পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়ানোর আমল মহানবী ﷺ-এর যামানায় প্রচলিত ছিল। তিনি সাহাবাদের সে আমল দেখেও বেআদবী মনে ক'রে বাধা দেননি। তিনি নামাযের মধ্যে যেমন সামনে দেখতেন তেমনি পিছনে। *(বুখারী-মুসলিম)* ঘন হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাখ্যা বুঝে সাহাবাগণের এই আমল অবশ্যই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাতে মৌন-সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

বলা বাহুল্য, এ কাজ যে মুস্তাহাব তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, তাবেঈনদের যামানা থেকেই এ আমল অনেকের কাছে বর্জনীয় হয়ে চলে আসছে। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আজকে যদি কারোর সাথে ঐ কাজ করি, তাহলে সে সেরকশ (দুরন্ত) খচ্চরের মত চকে যাবে।' *(ফাতহুল বারী ২/২৪৭)*

হযরত আনাস ﷺ বলেন, একদা নামাযের ইকামত হল। নবী ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং ঘন হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পিছন দিক হতেও দেখে থাকি।" আনাস ﷺ বলেন, এরপর আমাদের প্রত্যেকে নিজ বাহুমূল তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে এবং নিজ পায়ের পাতা তার পায়ের সাথে লাগিয়ে দিত। *(বুখারী ৭১৮, মুসলিম ৪৩৬, আবূ দাঊদ ৬৬২নং)*

হযরত জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাছে এলেন। সে সময় আমরা গোলাকার দলে দলে বিভক্ত ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আমি বিক্ষিপ্তরূপে দেখছি কেন?" অতঃপর একদিন তিনি আমাদের কাছে এসে (আমাদেরকে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত দেখে) বললেন, "তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মত কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।' তিনি বললেন, "প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।" *(মুসলিম ৪৩০, আবূ দাঊদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, ঘন করে দাঁড়ানোর অর্থ এই নয় যে, পরস্পর ঠেলাঠেলি ও চাপাচাপি করে দাঁড়াতে হবে। বরং এইরূপ দাঁড়ানোতে নামাযের একাগ্রতা ও বিনয় নষ্ট হতে পারে। অতএব যাতে পায়ে পা এবং বাহুতে বাহু স্বাভাবিকভাবে লেগে থাকে কেবল তারই চেষ্টা করতে হবে। আর তার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়াতে হবে। আর এ কথা বুঝা যায় উক্ত হাদীসগুলির সারনির্যাস থেকে।

কিন্তু মুফতী সাহেব (১৫২ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, আহলে হাদীসরা কুরআন-হাদীস থেকে মসলা গ্রহণ করার দাবী করে, অথচ 'এরূপ দাবী করাই ভুল বা সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়ার একটা পন্থা।'

এই শ্রেণীর কত অপবাদ ও বিদ্রূপের তীর তিনি হেনেছেন তাঁর এই রূহের মাগফিরাতের জন্য বখশে দেওয়া কিতাবে, যার হিসাব আল্লাহই নেবেন।

লিখেছেন, 'আপনি যদি হাদীস দেখিয়ে দেন তো আমরা উহার প্রতি

আমল করব। কেননা শুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী আমল করা আমাদের জিত হবে, হার হবেনা।'

প্রিয় পাঠক! তাঁর এ সুন্দর বাক্যে ধোঁকা খাবেন না। কারণ মযহাবের বিরুদ্ধে আমল না করাই তাঁদের দ্বীন। সুতরাং সহীহ হাদীস পেশ করলে তাঁরা মানবেন না যে, তা সহীহ। আবার সহীহ বলে মানলেও বলবেন মনসূখ। নচেৎ তার নানা ব্যাখ্য করবেন। যেমন আপনি বিভিন্ন স্থানে তাঁদের দাবী ও দলীল লক্ষ্য করেছেন। এখনও লক্ষ্য করুন ঃ-

বুখারী শরীফে আছে,

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'এ হাদীসের সনদ নেই।'

বলা হল, এর সনদ মুঅত্ত্বা মালেক, মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ, ইবনে খুযাইমা, দারাক্বুত্বনী ও বাইহাক্বীতে আছে।

বললেন, বুখারীতে 'কা'বুন' শব্দ নেই।

কিন্তু বুখারীতে সনদ-সহ 'কা'ব' শব্দ না থাকলে 'ক্বাদাম' শব্দ তো রয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

কিন্তু উনি (১৫৪ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'ইমাম বুখারী (রহঃ) কয়েক লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন যে হাদীসে পায়ের মিলানো সম্পর্কে কথা আছে ওই হাদীসটি যদি শুদ্ধ সনদের সঙ্গে থাকত তো নিশ্চিত ইমাম বুখারী তার শুদ্ধ বুখারীতে লিপিবদ্ধ করিতেন।'

অথচ ইমাম বুখারী সনদ-সহ আনাসের পায়ে পা লাগানোর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

তখন বলছেন, এটা তো হুজুরের আদেশ নয়, আমলও নয়।

যদি বলা হয়, নবী ﷺ তো ইমাম ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহাবাদের পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখেছেন। সুতরাং এ কাজে তাঁর মৌন-সম্মতি হল। আর আপনারাও সাহাবায়ে কেরামের আমলকে অস্বীকার করেন না, অন্য সময়ে 'আসহাবী কান্নুজূম' প্রয়োগ করেন। তাহলে মাথা চালছেন কেন?

বলেছেন, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে, গাঁটের সাথে গাঁট মিলিয়ে দাঁড়ানো

সম্ভব নয়। আমল ক'রে দেখান।

বলা হল, ব্যাখ্যা-গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা আছে তা গ্রহণ ক'রে, যতটুকু মিলিয়ে সহজে নামাযে দাঁড়ানো সম্ভব, ততটুকু আমল করব।

গাঁটের সাথে গাঁট মিলানো না হোক, হাঁটুর সাথে হাঁটু না মিলানো হোক, পায়ের পাতার সাথে পায়ের পাতা এবং বাহুমূলের সাথে বাহুমূল মিলানোর হাদীস তো বুখারী শরীফে সনদ-সহ রয়েছে। কাতারের ফাঁক বন্ধ করার জন্য আমরা ততটুকুই আমল করব।

উনি বলেছেন, সেটা তো ব্যাখ্যা হয়ে গেল। আর তা তাকলীদ হয়ে গেল। তাহলে আহলে হাদীসও তাকলীদে ফেঁসে গেল।

কিন্তু আহলে হাদীস যে 'ইত্তিবা' করে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর তাতে তো কোন দোষ নেই।

ওঁরা বলছেন, যখন কাঁধে কাঁধ, ঘাড়ে ঘাড়, হাঁটুতে হাঁটু ও গাঁটে গাঁট মিলানো সম্ভব নয়, তখন মিলানোর অর্থই ভুল। 'বা' যে অর্থে হবে হোক, 'ইলস্বাক্ব ও ইলযাক্ব' শব্দের মানেও 'মিলানো' বা 'লাগানো' নয়!

মুফতী সাহেব কাজের কথা উল্লেখ ক'রে (১৫৬ পৃষ্ঠায়) 'বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস হজরত ইবনে হাজার আসকালানী' (রহঃ)এর উদ্ধৃতি নকল করেছেন এবং বলেছেন, (বাহুমূলে বাহুমূল মিলানো ও পায়ে পা লাগানোর উদ্দেশ্য,) 'নামাজের কাতারকে ঠিক করা এবং কাতারের মধ্যে যাতে খালি না থাকে ভরপুর করার জন্য বেশি গুরুত্ব দেওয়া।'

তার মানে ইবনে হাজারও 'মিলানো' বা 'লাগানো' অর্থ মানেন না। অথবা সাহাবাগণ আদৌ বাহুমূলে বাহুমূল ও পায়ে পা লাগাননি।

কিন্তু আসলে তা নয়। যেহেতু পরবর্তীতে ইবনে হাজার বলেছেন,

واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل - وهو عند ملتقى الساق والقدم - وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه...... قال أنس: "فلقد رأيت أحدنا الخ " وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي ﷺ، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته، وزاد معمر في روايته: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس".

অর্থাৎ, নু'মানের এই হাদীসে দলীল রয়েছে যে, ওযূর আয়াতে 'কা'ব' (গাঁট) বলতে উদ্দেশ্য হল পায়ের দুই পাশে উঁচু হয়ে উঠে থাকা হাড়, যা পায়ের নলা ও পাতার মিলন-ক্ষেত্রে রয়েছে। আর এটাকেই পার্শ্ববর্তী সাথীর সাথে মিলানো সম্ভব।.......

আনাস বলেন, এরপর আমাদের প্রত্যেককে দেখেছি যে, (নিজ বাহুমূল তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে এবং নিজ পায়ের পাতা তার পায়ের পাতার সাথে লাগিয়ে দিত।) এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লিখিত আমল নবী ﷺ-এর যামানায় ছিল। আর এর দ্বারাতেই কাতার কায়েম ও বরাবর করার উদ্দেশ্য বয়ান করার উপর হুজ্জত সম্পন্ন হয়। মা'মার তাঁর বর্ণনায় (আনাসের উক্তি) আরো বেশি উল্লেখ করেছেন যে, 'আজকে যদি কারোর সাথে ঐ কাজ করি, তাহলে সে সেরকশ (দুরন্ত) খচ্চরের মত চকে যাবে।' *(ফাতহুল বারী ২/২৪৭)*

পক্ষান্তরে হাদীসে ঘাড়ে ঘাড় মিলানো ও কাঁধে কাঁধ মিলানোর কথা নেই। অনেকে হয়তো কাঁধে কাঁধ মিলানোর অর্থ ক'রে থাকে। কাঁধ হল যার উপরে কিছু বহন করা যায়। আর তার আরবী হল 'আতিক্ব' বা 'কাতিফ'। বাহুর আরবী 'আযুদ'। আর এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে 'মানকিব' (বাহুমূল)। সুতরাং বাহুমূলের সঙ্গে বাহুমূল মিলানো খুবই সহজ। অনুরূপ 'ক্বাদাম' (পায়ের পাতা)র সাথে 'ক্বাদাম' মিলানোও খুব সহজ। হাঁটুর সাথে হাঁটু সিজদা ও বসা অবস্থায় মিলানো যায়। সুতরাং সম্ভব ও সহজের উপর আমল করতে দোষ কোথায়?

আর বাহুমূলের সাথে বাহুমূল মিলিয়ে দাঁড়ানো এবং সাথীর জন্য নরম ক'রে দেওয়ার প্রশংসাও এসেছে হাদীসে। "তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুসমূহকে (পাশের নামাযীর জন্য) নরম রাখে।" *(আবূ দাউদ ৬৭২নং)*

যদি তা না করা হয়, মিলিয়ে দাঁড়ানো না হয়, তাহলে কাতারের ফাঁক বন্ধ করবেন কীভাবে? 'সাদ্দে খালাল ও ফুর্জাহ' হবে কীভাবে? 'তারাস্ব' বা জমাট হয়ে দাঁড়াবেন কীভাবে? আছে কি এমন কোন হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, 'ফাঁক ফাঁক ক'রে দাঁড়াতে হবে?' সুতরাং সাহাবাদের হাদীস বুঝার মতো আমাদেরও কি বুঝা উচিত নয়?

পরিশেষে বলি, এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা অবশ্যই উচিত নয়। পাশের নামাযীর সাথে পা মিলাতে গিয়ে যেন বাহু থেকে বাহু দূর না হয়ে যায়। যে পা সরিয়ে নেয়, জোর ক'রে তার সাথে পা লড়ালড়িও বৈধ নয়।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ

মুফতী সাহেব সাহাবীর ইজমা দ্বারা ২০ রাকআত তারাবীহ প্রমাণ করার

জন্য নবী ﷺ-এর চিরাচরিত ৮ রাকআত নামাযকে তাহাজ্জুদ এবং তা রমযান ও অরমযান সকল মাসের জন্য আম করেছেন। তিনি বলেছেন, তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ পৃথক নামায।

আহলে হাদীস বলে, কিয়ামুল্লাইল বা রাতের নামাযকে রমযানে 'কিয়ামে রামায্বান' বা 'তারাবীহ' বলা হয়, অন্য মাসে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

তিনি (১৬১-১৬২ পৃষ্ঠায়) বলেছেন, 'সাবাস দারুন প্রমাণ করেছেন---ইহা তো এমনি হল যেমন কেহ বলেন ১১ মাসে আমি আমার স্ত্রীকে স্ত্রী বলি বা মনে করি আর কেবল এক মাসে আমার স্ত্রীকে মা বলি......কারণ মেয়ে তো একই।'

যুক্তিবাদী মুফতীর এই যুক্তি পাঠককে কেমন লেগেছে জানি না। তবে আমাদেরকে অন্য কিছু লাগে। যেখানে নাম-ভিন্নতার কথা, সেখানে সম্পর্ক-ভিন্নতার উপমা কেন? কেউ যদি তার স্ত্রীকে কিছু সময় 'স্ত্রী' ও কিছু সময় 'মা' বলে, তাহলে সে তো নেহাতই পাগল ছাড়া কিছু নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি স্ত্রীর বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন নাম দেয়, তাহলে সেটা তো পাগলামি নয়।

স্ত্রী হাসীনাকে মায়ের বাড়িতে 'হাঁসু', শ্বশুর-বাড়িতে 'হাসীনা' এবং স্বামী নির্জনে আদরের সাথে 'হাসনুহানা' বলে ডাকে, সেটা কি অযৌক্তিক?

অবস্থান্তরে একই জিনিসের নাম বিভিন্ন হতে পারে। সময় ভেদে এক জিনিসের নামের ভিন্নতা প্রায় সকল ভাষাতেই আছে। যেমন, প্রথম রাতের চাঁদকে 'হিলাল', পূর্ণিমার চাঁদকে 'বাদ্‌র' ও সাধারণ চাঁদকে 'ক্বামার' বলা হয়। ভোরের খাবারকে 'সাহূর', সকালের খাবারকে 'ফুত্বূর', দুপুরের খাবারকে 'গাদা' এবং রাতের খাবারকে 'আশা' বলা হয়। প্রথম পর্যায়ের খেজুরকে 'বালাহ', তারপরের খেজুরকে 'বুস্‌র', ডাঁসা খেজুরকে 'রুত্বাব' ও পাকা খেজুরকে 'তাম্‌র' বলা হয়। সময় গুণে মানুষও শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে থাকে। সূর্য ওঠার ১০/১৫ মিনিট পর নামাযকে ইশরাকের নামায বলে। আবার নাশ্‌তা খাওয়ার সময় পড়লে চাশতের নামায বা স্বালাতুয যুহা বলে। পরন্তু এই নামাযকেই আওয়াবীনের নামায বলে। তাহলে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাযকে রমযানে কিয়ামে রামায্বান বা 'তারাবীহ' বললে দোষ কোথায়? আট রাকআত প্রমাণ হয়ে যাবে বলে?

মুফতী সাহেব (১৬২ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'তাহাজ্জুদ তো সারা বৎসর পড়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু তারাবীহ তো কেবল রমজান মাসে পড়ার কথা বলা হয়েছে। দুটো এক কি করে হতে পারে।'

তারপর তিনি (১৬৩ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, 'এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার জানা গেল যে হুজুর তারাবীহ নামায পড়িয়েছেন কেননা রমজান মাসে রাত্রে ফরজ নামাজের পর তারাবীহ নামাজ ছাড়া আর কি নামাজ হতে পারে।'

আহলে হাদীস জানে, 'তারাবীহ' নামটা নবী ﷺ-এর দেওয়া নয়। এ নাম পরবর্তী কালে সলফদের দেওয়া নাম।

'তারাবীহ' মানে হল আরাম করা। যেহেতু সলফে সালেহীনগণ ৪ রাকআত নামায পড়ে বিরতির সাথে বসে একটু আরাম নিতেন, তাই তার নামও হয়েছে 'তারাবীহ'র নামায। আর ঐ আরাম নেওয়ার দলীল হল মা আয়েশার হাদীস; যাতে তিনি বলেন, 'নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্‌র) নামায পড়তেন।' *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮নং)*

উক্ত হাদীসের মানে হল, তিনি প্রথম ৪ রাকআত নামাযকে এক সময়ে একটানা পড়েছেন। অর্থাৎ, তিনি ২ রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথেই আবার ২ রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর বসে বিরতি নিতেন। অতঃপর তিনি উঠে পুনরায় ২ রাকআত নামায পড়ার পর সাথে সাথে আবার ২ রাকআত পড়তেন। অতঃপর আবার বসে একটু জিরিয়ে নিতেন এবং সবশেষে ৩ রাকআত বিত্‌র পড়তেন। এখান থেকেই সলফগণ ১১ রাকআত নামাযের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁরা প্রথমে ২ সালামে ৪ রাকআত নামায পড়ে একটু আরাম নেন। অতঃপর আবার ২ সালামে ৪ রাকআত নামায পড়ে পরিশেষে ৩ রাকআত বিত্‌র পড়েন। *(মুমতে' ৪/১৩, ৬৫, ৬৭)*

যে তিন রাত নবী ﷺ তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিন রাতে কি তিনি পৃথকভাবে তাহাজ্জুদও পড়েছিলেন? না, পড়েননি।

যেহেতু মহানবী ﷺ প্রথম রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু ক'রে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন। দ্বিতীয় রাত্রেও তার প্রথম ভাগে শুরু ক'রে রাত্রের অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন এবং তৃতীয় রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু ক'রে শেষ রাত অবধি নামায পড়েছিলেন। *(সহীহ আবূ দাউদ ১২২৭, সহীহ তিরমিযী ৬৪৬, সহীহ নাসাঈ ১৫১৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩২৭নং)*

রমযানের যে তিন রাতে নবী ﷺ তারাবীহ পড়েছিলেন, তা কত

রাকআত ছিল?

মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায সম্বন্ধে সর্বাধিক বেশী খবর রাখতেন যিনি, সেই আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামায কত রাকআত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না।' *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৮-নং)*

মুফতী সাহেবের মতে এ ছিল তাহাজ্জুদের ব্যাপারে। তাহলে তারাবীহর ব্যাপারে কী? রমযানে কি তিনি পৃথকভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়েছেন? সাহাবাদেরকে নিয়ে ঐ নামাযই কি তিনি ১১ রাকআত পড়েননি?

عن جابر بن عبد الله ﷺ قال : صلى بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج، فلم نزل فيه حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا : يا رسول الله! اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا، فقال : إني خشيت أن يكتب عليكم. رواه ابن نصر والطبراني

জাবের বিন আব্দিল্লাহ ﷺ বলেন, রমযান মাসে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে আট রাকআত নামায পড়লেন এবং বিত্র পড়লেন। পরবর্তী রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম যে, তিনি বের হবেন। কিন্তু ফজর পর্যন্ত আমরা মসজিদেই অপেক্ষা করলাম। তারপর (তাঁর গৃহে) প্রবেশ ক'রে আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম যে, আপনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন।' তিনি বললেন, "আমি ভয় করলাম যে, তোমাদের জন্য তা ফরয ক'রে দেওয়া হবে।" *(ইবনে নাস্র, ত্বাবারানী)*

তাহলে রমযানে যেটা কিয়ামে রামাযান, সেটা অন্য মাসে তাহাজ্জুদ এবং তার রাকআত সংখ্যা ১১ রাকআত হল না কি সাহেব?

বাকী থাকল সাহাবাগণের ইজমা ও আপনাদের পেশকৃত অন্যান্য দলীলসমূহের কথা, তার ব্যাপারে আহলে হাদীসরা বলে, ২০ রাকআত তারাবীহ নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন মারফূ' সহীহ হাদীস নেই। সাহাবাদের তরফ থেকে যে আষার বর্ণনা করা হয়, তার সবগুলিই যয়ীফ। *(মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানীর পুস্তিকা 'স্বালাতুত তারাবীহ' দ্রষ্টব্য)*

যেখানে খোদ মহানবী ﷺ-এর সূর্য শরীয়তের মেঘহীন আকাশে

জাজ্বল্যমান রয়েছে, সেখানে 'আসহাবী কান্নুজূম'-এর পথ দেখার তারকা কি উপকার দেবে সাহেব?

তবুও সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, '(খলীফা) উমার উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ্-দারীকে আদেশ করেছিলেন, যেন তাঁরা রমযানে লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত তারাবীহ পড়েন।' *(মালেক ২৪৯নং, বাইহাক্বী ২/৪৯৬)*

কিন্তু তার থেকে বেশি পড়া যাবে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। সঠিক হল, তারাবীহ নামাযের সুন্নতী রাকআত সংখ্যা এগারো। আর নফল হিসাবে ধীরতা-স্থিরতা বজায় রেখে কেউ বেশি পড়তে চাইলে অনির্দিষ্ট সংখ্যায় সে পড়তে পারে।

তিন তালাক প্রসঙ্গ

একই কারণে আহলে হাদীসের মতে এক সাথের তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হয়। যেহেতু সেই গণ্যতাই মহানবী ﷺ ও আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর যুগে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষ কারণে উমার ﷺ তিন তালাককে তিন বলে গণ্য করেন।

আহলে হাদীস উমার ﷺ-এর এ ইজতিহাদ মেনে নেয়নি। কারণ তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ দুই ব্যক্তিত্বের ফায়সালা তার বিপরীত।

তাতে মুসলিমদের অনেক ক্ষতি ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি তার ফলে নিষিদ্ধ 'হালালা' বিবাহ ও 'ধার করা ষাঁড়' ব্যবহার করতে হয়। আর পরিকল্পিতভাবে সেই বিবাহ দ্বারা স্ত্রী হালালও হয় না।

যুক্তিতে তারা বলে, রবিবার যোহরের সময় যদি কেউ আগামী সোম ও মঙ্গলবারের যোহর পড়ে নেয়, তবে এক ওয়াক্ত ছাড়া বাকী আদায় হবে না। তেমনই এক সঙ্গে ৩ তালাক দিলে একটাই গণ্য হবে, বাকীগুলি গণ্য হবে না।

মাস্টার কোন ছাত্রকে তিনবার মারলে এক এক বারে ১০ চাবুক মারলেও একবারই ধরা হয়। তেমনি তালাক দেওয়ার সময় রাগে এক সঙ্গে ১০ বার 'তালাক' বললেও তা একবারই ধর্তব্য হয়।

এ ব্যাপারে দলীল ইত্যাদির অবতারণা না ক'রে আমি আমার বন্ধুবর মওলানা মুকাম্মিল হক ফাইযী রিয়াযী প্রণীত 'কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে তালাক' পুস্তিকা পড়তে আহবান জানাই।

পরিশেষে দুআ করি, মহান আল্লাহ যেন আমাদের উভয় দলকেই গোঁড়ামি থেকে দূরে রাখেন, সকলকে সঠিক পথ দেখান এবং সেই পথে চলতে তওফীক দান করেন, যে পথ তাঁর নবী ﷺ-এর প্রদর্শিত। আজীবন

যেন সেই পথেই প্রতিষ্ঠিত থাকি। সে পথেই চলতে চলতে যেন আমাদের মরণ হয়। আমীন।

اللهم اجعلنا ممن اختاروا هداهم على هواهم ، ورضوا بشريعتك، واطمأنوا بها ، وانشرحت لها صدورهم ، فلم يبغوا عنها حولا ، ولم يرضوا بها بديلا ، اللهم أرنا الحق حقا ، وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا ، وارزقنا اجتنابه ، اللهم حبب إلينا الإيمان ، وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، واجعلنا من الراشدين ، اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله ، فرآه حسنا ، فأصبح من الخاسرين أعمالا ، الضالين طريقا ، واهدنا صراطك المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. (اللهم آمين)

সমাপ্ত